Quest



An Academic Journal

Quest An Academic Journal

ULUBERIA COLLEGE Uluberia, Howrah



# Quest

An Academic Journal

#### Editor:

Dr. Aditi Bhattacharya

#### Editorial Board:

Dr. Debasish Pal, Dr. Siddhartha Sankar Bhattacharya,
Dr. Momotaj Begam, Sm. Chandana Samanta,
Sri Dipak Kumar Nath

An Academic Journal Vol 5, 2009-2010

Printed by : Charulekha Printer

Uluberia, Howrah Ph. No.- 26610076

## Forntispiece:

Couriest:

Living Biographies of Great Philosophers By Henry Thomas and Dar Lee Thomas Garden City Publishing Co., Inc., New York

# Content

	Section - I		
	জয় গোহামী ও মালতীবালা বালিকা বিন্যালয়	ভঃ মমতাজ বেগম	1-4
	'চিরঞ্জীব শরদিন্দু মনন : মূল্য বোধ,		
	নন্দন ও আধুনিকতার দিশারী'	পিউ ভট্টাচার্যা	5-9
	পাবলো নেরুলা : কবি ও কাব্যিকতা	সূপ্রিয় ধর	10-15
	अरबाताः -	হেমন্ত বিপাঠী	16-20
	Section - II		
	Value of Philosophy	Dr. Aditi Bhattacharya	21-23
	Prospering Thalland - India		
	Economic Partnership	Tuhina Sarkar	24-28
	নাগার্জুনের মৃলমধামককারিকা অবলয়নে		
4	বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে কাল এর অন্তির	জয়িতা দৰ	29-33
	Section - III		
	Giant Magnetoresistance		
	(GMR) and its Role in	Dr. Gautam Kumar Mallik	34-53
	IT Revolution		
	Species without border	Dr. Siddhartha Sankar Bhatt	acharya
			54-56
•	Mechanism of Oxoallopurinol -		
	A Uric Acid loweing Drug.	Dr. Bireswar Mukherjee	57-61
	Incredible Natural Abundance		
	double Quantum Transfer		
	Experiment	Dr. Bireswar Mukherjee	62-65
	(2d-Inadequate) : 13C - 13C Conne	ectivity	
	<ul> <li>নতুন স্বা দ্ববমুক্ত পরমানু শক্তি দাও</li> </ul>	ডঃ গোপেন্দ্র নাথ রায়	66-68
	যোগাযোগ বাবস্থায় বিস্ময়কর পরিবর্তন -		
	রেডিও থেকে ইনটারনেট	ডঃ গোপেন্দ্র নাথ রায়	69-86
	Section - IV		
	Globalisation and food Security	Dinak Kumar Nath	87-104

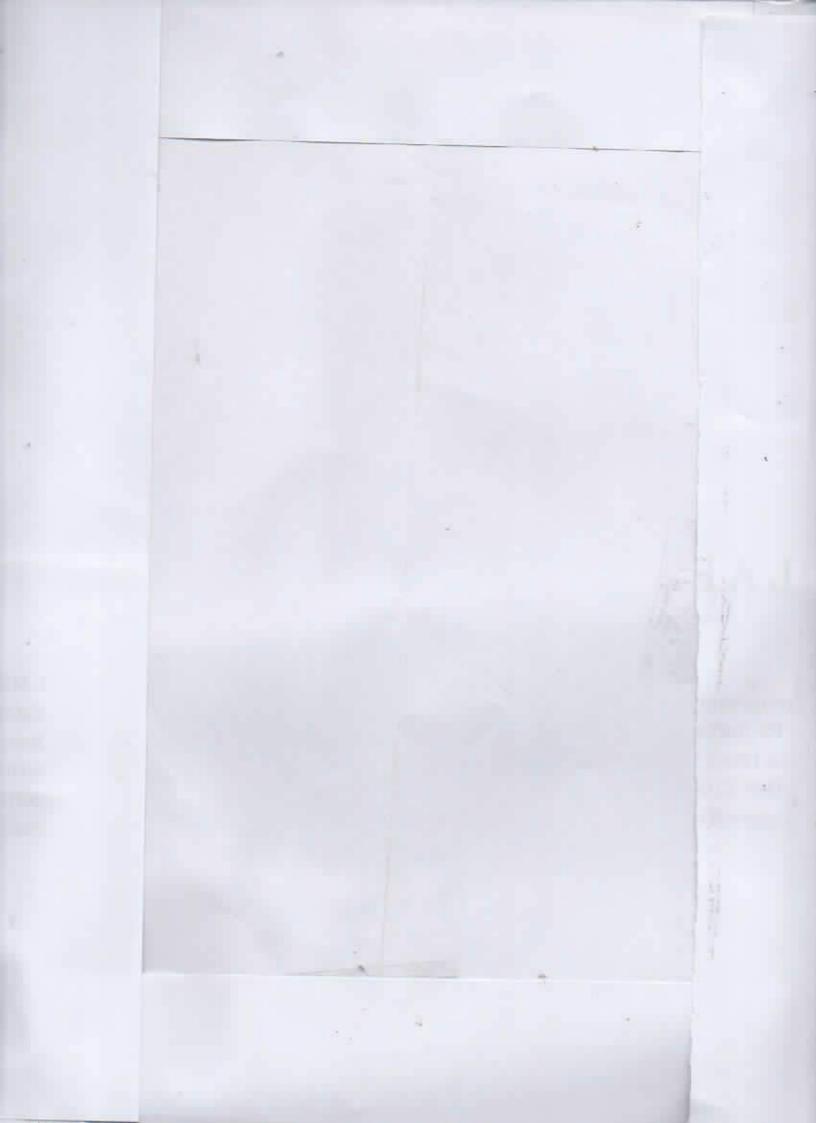


# Editorial

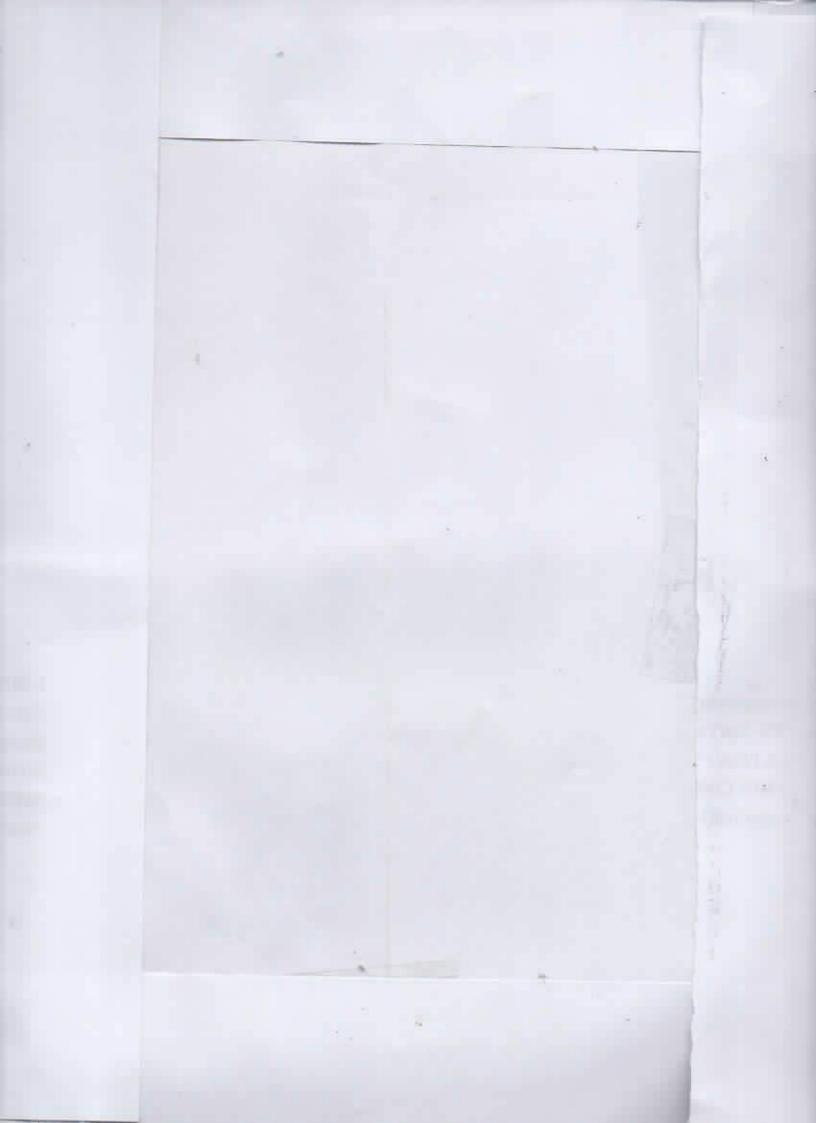
'Quest'- our Academic Journal first came out in 2005. Since then, three more issues appeared upto 2008. Though we have applied for the Registration of the Journal, we have yet to receive the registration number. We understand that it is still in process. However, academic matters at our end cannot be kept in abeyance. Ideas sprout; questions raised in the course of daily teaching suddenly trigger a new adventure in ideas; old themes ramify into new directions or at least yeild themselves to new interpretations; new areas of knowledge need to be understood and appraised; science opens up new vistas and research takes wings. And this journal may well be the cradle of these ideas or at least a granary of fresh harvest as before.

So, once again we have ventured to put together the contributions of our faculty-members. The buds that they fostered sometimes with zest, sometimes with trepidation, now updated in these pages.

Once again, we hope to bask in the warmth of your support. Which is not to say, however, that we will not stand chastened by the lessons thrown up by your critical appraisal of the ideas expressed in these pages. New lamps may burn where we have not taken enough care to ignite the spark.



Section I Literature



# জয় গোস্বামী ও মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়

ডঃ মমতাজ বেগম বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

'জর ছোট ছোট ছবি, ছোট ছোট অনুভূতি আর দেখা, দ্রুত যাত্রাপথে পড়ে থাকা চেনা বস্তু আর ঘটনা তার কবিতার সম্পৃক্ত করেছেন।' (নৃপেন সান্যাল/আনন্দবাজার, ২৫ শে নভেম্বর, ১৯৯৫)

কবিতাকে নিজের রক্ত মজ্জার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিল বলেই জর গোস্বামী এক স্বতন্ত্র পথ নির্মাণ করতে পেরেছেন বাংলা কাব্যাসনে। এক শালিত বৈচিত্রাপূর্ণ বিষয় তার কবিতাকে যেমন দিয়েছে দীপ্তি তেমেনি আজিক সচেতনতার কঠিনতর সাধনার বিজ্ঞয়লজীর জয়মালা পরিয়ে দিয়েছে অনায়সে। সংসারে যা কিছু অচ্চ্যুত, অচেনা অথবা আবরলে ঢাকা তাকেই অনায়াসে তুলে এনেছেন কবিতায়। বিংশ শতাব্দীর শেব দিক থেকে যিনি (১৯৭০ থেকে) কাব্য রচনা করে প্রেম, প্রতিবাদ, প্রতিহিংসা ও জীবনের নানা জলছবিকে টেনে বের করে এনেছেন মুখোলের আড়াল থেকে। তার অসংখ্য কাব্যায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- 'জীসমাস ও শীতের সন্টেভছে' (১৯৭০), প্রত্নজীব (১৯৭৮), আলেয়া হুদ (১৯৮১), উন্মাদের পাঠ্যক্রম (১৯৮৬), ভূতুম ভগবান (১৯৮৮), ঘূমিয়েছ করাপাতা (১৯৮৯), আজ যদি আমাকে জিলোস করো (১৯৯১), গোলা (১৯৯১), পাগলী তোমার সঙ্গে (১৯৯৪), 'বল্লবিদ্যুং-ভর্তি থাতা' (১৯৯৫), 'পাখি ঘুঁস' (১৯৯৫), 'ও! স্বপ্ন' (১৯৯৯) 'পাতার পোষাক' (১৯৯৯) 'সূর্যপোড়া হাই' (২০০০) প্রভৃতি।

বর্তমান যুগের অন্যতম রোমান্টিক কবি জয় গোস্বামী। বীভৎস কন্ধাল করোটি ভরা পথ অভিক্রম করতে করতে কখনো ফ্রান্তি অনুভব করেননি তিনি প্রেমের মধ্যে অপ্রেমের বাস্তব চেহারাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রেম সম্পর্কে কবির বক্তব্য-

'প্রেম আমার কাছে আলো আধার একটা প্রাচীন ধারণা হিসেবে নয়, একেবারে দিনের আলোর মতেই সতা। প্রেম আমার কাছে নিভূত আনন্দ বেদনার জিনিস।' ফেদরে প্রেমেরশীর্য পৃ: ৫১) এমনই একটি কবিতা 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়।' একটি নামহীন কালো মেয়ের জীবনপাঠ সংসার বিদ্যালয়ে কতথানি জায়গা প্রেছে তারই নাটকীয় উপস্থাপন কবিতাটি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'হঠাৎ দেখা' কবিতায় বলেছেন- 'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে'। আমাদের জীবনের সব স্মৃতি থেকে যায় বাস্তবের প্রথর, কঠিন আলোর অন্তরালে। একদিকে এই কবিতাটি প্রেমের কবিতা, অনাদিকে প্রতিবাদী কণ্ঠসরের কবিতা অথবা প্রেমিকের অন্যায় আবদারের বিরুদ্ধে বিক্ষোন্ডে, হতাশার, অবক্ষয়ে প্রশ্নে মেয়েটির মুখরিত হওয়ার কবিতা। এর সদৃত্তর কোথাও নেই যেন।

কবিভাটি শুরু হয়েছে গল্পের ছলে। বেণীমাধব যে পুরুষ সমাজের প্রতিনিধি, নায়িকার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে বয়ঃ সন্ধিক্ষণের উচ্চাঙ্গ মৃতুর্তে (নবম শ্রেণী) পরণে শাড়ি যা পরিপূর্ণ বাঙালী নারীর পরিচিত চিত্র।

> 'আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন শাড়ি আলাপ হলো, বেনীমাধব, সূলেখাদের বাড়ি।'

সকল নারীর হয়ে জয় গোম্মামী নারী সুলভ আবেগ, মনন্তাত্বিকতা, পুরুষের সারিধালাভ প্রভৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। মেধাবী ভালো ছেলে বেশীমাধব সন্তায় পাওয়া এই কালো মেয়ের শরীর মনে জাগিয়ে দেয় প্রবৃত্তির তীর ক্ষূধাকে, ঘর বাঁধার স্বপ্রকে, নির্মম অবস্থান থেকে উচ্চ অবস্থানে উত্তীর্দের বাসনাকে। কিন্তু সামাজিক অবস্থানের বিচারে এ মেয়ে মানানসই নয়, কারণ সে কালো এবং তার বাবা দোকানে কাজ করে। সময়ের বহু ঘূর্নাবর্তে বেনীমাধবরা ঠাকাতে থাকে মেয়েদের ভালো ছেলের হওয়ার গৌরবে। বেণীমাধবের নতুন প্রেমিকের কথা জানতে পেত্রে তার হৃদর যেমন জুড়িয়েছিল তেমেনি পুড়িয়েছিল। নিজের হীনমনাতা ও ঈর্বা একই সাথে কাজ করেছে। অন্তর বেদনার এই বৈপরিতা মানুষের গভীর মনের চেহারাকে প্রকাশ করেছে। ছন্দের তালে তালে দুলে ওঠা শরীর মন পুরুষের সামিধ্য পেয়ে যখন বঞ্চিত হয় তথন সমাজের দৃষ্টিতে সে হয় 'নষ্ট মেয়ে', 'পচা শশা', বা 'পচা চালকুমড়ো'। কিন্তু যার জন্য তার এ দৃগতি সে জায়গা করে নেয় সমাজের উচ্চকোটিতে। তার ভাল চাওয়া ছাড়া অনা কিছু করার থাকে না। কারণ যে প্রেমের মধ্যে থাকে শুকানো ইতিহাস, জীবন সেতৃ নয়, সে প্রেম যে মুখ খ্বড়ে পড়বে তা বলাই বাহল্য। জীবনের কৌশলগত শিক্ষা আয়ত্ব করার জনা ব্যবহার করেছে মেয়েটিকে বেণীমাধব, আর মেয়েটি অন্ত মেলাতে পারেনি জীবনের। ভুল অঙ্কের ছকে শেষপর্যন্ত জীবন শতসহস্র সেলাই ও তালিতে বন্দী, যেখানে কোন স্বতন্ত্ৰতা নেই।

'আমি এখন এই পাড়ায় সেলাই দিদিমনি'। গুধু সে নয় এমন নাম পরিচয়হীন মেয়েরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এমনই ভূলের স্বীকার — রাতে যখন ঘুমোতে যাই একতলার ঘরে মেঝের উপ বিছানা পাতা, জ্যোৎসা এসে পড়ে আমার পরে যে বোন ছিলো চোরাপথের বাঁকে মিলিরে গেছে, জানি না আজ কার সঙ্গে থাকে আজ জুটেছে, কাল কী হবে কালের ঘরে শনি'

প্রথানেই দেখা খাছে একতলার অর্থাৎ নিমাবিরের মাটি লাগা জীবন থেকে ব্যরা উঠতে পাত্র না অব্দ্র জানালার ফাঁক দিরে আসা রহসাময় মধুর আলার হাতছানি বারবার তামের হিসেবে ভূল ঘটায়। বঞ্চিত মেরেটির অন্তরে নির্মল প্রেমের দীপের নিভূ নিভূ লিখাকে বার্থভাবে আঁকড়ে রাখার চেটা আধুনিক নারীর অন্তর বাইজের ছব্দে পরিস্ফুট। জীবন ইতিহাসের চোরাপথে হারিরে যায় এমন কত মানুয — ইতিহাস অমের হিসাব রাখে না এমন কি তামের চোথের জালের মূলাও দেয় না কেউ। জীবনে বথার্থ সঙ্গীর অভাবে ক্ষণকালের মায়াবী অবস্থাকেই সতা বলে খ্রীকার করে নিতে বাবা হয় ভারা। ভবিষাতের ঘর-শনি লাগা অক্ষরার।

কবিজাটির শেষ দৃটি লাইন যেন জ্বনন্ত প্রতিবাদ – 'তবু আগুন, বেণীমাধব, আগুন জ্বলে কই ? কেমন হবে, আমিগু যদি নট্ট মেয়ে হই ?'

আবৃত্তির আগুন, জীবনের আগুনের বা সতাকে স্বাকীর করার প্রশ্নে এখনও প্রশ্ন থেকেই যায়। নিজেকে সামলে রেখে সেলাই দিদিমদি হয়েছে সে কিন্তু সেও ভেসে যেতে পারতো সমজের শ্রোতে। দুর্যোচার, প্লাবনের মধ্যেও নিজেকে সেলাই করে রেখেছে। মৃত অথবা প্রায় মৃত হয়ে অজ্ঞশ্র প্রশ্নকে মনে প্রাণে যুটিয়ে তোলা হাড়া যেন তার আর কিছুই করার থাকে না।

জীবনের বর্ণপরিচরটা আমাদের শেখা হয় না সঠিকভাবে। অই বার বার ফেল করি। অসভাতার কালো ধোঁয়ার অভিক্রের প্রতিটি হাড় বখন করলা হয়ে যার তখনও অ চামড়ার প্রলেপে ঢাকা থাকে। জরগোমানী প্রেমকে দেখেছেন আগাগোড়া। একেবারে জন্মমূহূর্ত থেকে তার পথ চলা শুরু হয়। আজকের প্রেম শুধু দুই হৃদরের চাওয়া পাওয়ার স্বপ্ন নর বরং বলা যার দুই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ভূমির বান্তব হিসেবী পটভূমি।

জন্ম গোস্বামীর এ কবিতা মস্তিষ্ট নির্ভন কবিতা নয়, হৃদরনির্ভন কবিতা। একটা ট্রনটনে জনুভূতি নিয়ে পাঠক মানুষের নতুন রঙকে চিনে নের। কবির নিজের কথাতেই কবিতার বৈশিষ্ট্য উঠে আসে —

- 'কবিতায় কী দরকার, কী দরকার নয়। য়া মনে আসে লিখি।' (কবিতা প্রতিমাসে — সাক্ষাতকার)
- 'ষীকার করব, আমি আত্মজীবনীই লিখতে চেটা করি। এই পৃথিবীতে, পৃথিবীর বাইরেও আমার জীবদ্দশায় যা কিছু ঘটছে, ঘটরে। সবই আমার আত্মজীবনী।'
   (হৃদয় প্রেমের শীরে), পৃঃ ১৪।

শব্দ বাবহার, ছলের প্রয়োগ এবং স্বহাদয় অনুরাগ ও অনুভবে তাঁর কবিতা একেবারে মানব জীবনের আঁতে গিয়ে ঘা লাগায়। আমাদের সভ্যতা অনেক এগিয়েছে, বদলেছে মানুবের ভাব-ভাবনাও, কিন্তু পুরুষতাদ্রিক সমাজে নারীর অবস্থান — কালো-ফর্সা, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র অথবা নষ্ট মেয়ের জায়গা থেকে খুব বেশী বদল হয়নি। প্রেম বা দাম্পত্য জীবন যে কোনো ফ্রেমের দিকে তাকানো যাক না কেন দোরের ভাগীদার হয় মেয়েরাই — কখনো না বলা অর্জস্কুট আচরলে, কখনো বা হিংপ্রতায়। আজকের মেয়েরাও যেন বলতে পারে —

'কেমন হবে আমিও যদি নষ্ট মেয়ে হই ?' আমাদের হৃদয়ের প্রেমের গল্প অধরাই থেকে যায়।

জর গোস্থামীর অধিকাংশ প্রেমের কবিতাই অপ্রেমের যান্ত্রণার কাতর, বিছল ও ব্যাথাতুর। প্রেমের পিচ্ছিল পথে সরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মানুবের যে বান্তব অবস্থা হয় তা অব্যক্ত অকল্পনীয়ই থেকে যায় অন্যপক্ষের। সেদিন প্রশ্ন জাগে —

'বেণীমাধব, এখন কি আর আমায় মনে পড়ে ?'

উত্তর আসে না। অসাধারণ এই নাটকীয় বাক্প্রতিমা জীবনের স্বরূপকে জীবন্ত করেছে। নারীমনের কাশ্বিত বাসনার অচরিতার্থতা, বঞ্চনার সহজ্ঞ সরল উপস্থাপন এই কবিতা। অন্য নারীর সঙ্গে বেণীমাধবকে দেখলেও ভারতীয় কল্যাণবোধ, প্রেম-প্রীতি-ভাগের মহত্ব থেকেই সে বলতে পেরেছিল — 'ওদের ভালো হোক'।

# 'চিরঞ্জীব শরদিন্দু মনন স্থা বোধ নন্দন ও আধুনিকতার দিশারী'

পিউ ভট্টাচার্যা শিক্ষা শিক্ষণ বিভাগ

শরদিন্দু রচনা সমন্তকে (প্রথম - নাদশ খন্ড) বিষয় ভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই ঐতিহাসিক গল্প ও উপন্যাস, গোল্রেন্দা গল্পকাহিনী, রোম্যান্টিক উপন্যাস, নানা স্বাদের হেটিগল্পের সংগ্রহ ও কিশোর সাহিতা — এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়।

ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির কঠানো, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি ও চরিত্র ব্নন — এই তিনটি লক্ষণে ইতিহাসের সেই সমকালীন দেশ-কাল-প্রাত্তর আশ্বাদ দেয়। গদাধারা তাঁর নিজস্ব ঘেমন সূবহ, সূত্রোত, পরিজ্ঞয়ঃ আভিজ্ঞাতাপূর্ণ তেমনি মনোহারী। ঐতিহাসিক স্থান-কাল-পাত্র কিভাবে স্বাদ্, স্বাজ্বসলিলা, প্রবহমান লেখনীর জাদৃতে কল্পনার নিটোল ছায়াছবিতে প্রাণসঞ্চার করে তাকে সূপরিবাহী ও অনায়াসগতি করে তোলে তার প্রতাক্ষ প্রমাণ উপরোক্ত গল্প ও উপন্যাসগুলি কোনটিই একঘেয়েমিতে আক্রনন্ত নয়। এক একটি গল্প বা উপন্যাসের উৎসধারা, পরিবেশ, ঘটনাক্রম ও চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক কাহিনীপ্রোতের সৃষ্টি করেছে। ঐতিহাসিক কল্পনা যে কত মৌলিক চিন্তাধারার জন্ম দিতে পারে, এবং সেগুলি কত রকমের অভিনব গন্য ধারার রূপান্তরিত হয়ে যায়, তা এগুলিকে অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে বোঝা যায়।

ইতিহাসের কাহিনী নিমেই আমানের দেশে গদা গল্পের সূত্রপাত। শশিচন্দ্র দত্ত ইংরেজীতে কিছু গল্প সিমেছিলেন ইতিহাস অবলম্বনে। ভূদেব মুখোপাধারে বাং দুটি গল্প লেখন। তার মধ্যে একটি 'অকুরীয় বিনিময়' যা বিষমচন্দ্রের 'দুর্গেশ নন্দিনীতে' কিছু ছায়া ফেলেছে। বিছমচন্দ্র ইতিহাসকে পশ্চাৎপট করে তার রোমান্সগুলিকে জমিয়ে দিয়েছেন। তার পর শশিচন্দ্রের স্নেহলালিত আতৃপুত্র রমেশচন্দ্র দত্ত রীতিমত ইতিহাস অনুগত উপন্যাস লিখলেন। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসেরই খন্ড ছিন রূপ দেখা গেল হরি - সাধন মুখোপাধ্যায়ের গল্পে। তার পর এলেন যদুনাথ ভট্টাচার্য। বাংলার ইতিহাস থেকে কিছু বীর-পুরুষ বেছে নিয়ে কল্পনা মিশিয়ে উপন্যাস লিখলেন। তা স্বদেশী এবং ঐতিহাসিক হল বটে, কিছু ঠিক উপন্যাস হল না – পাঠকের মন ভোলাতে পারল না। তার পরে এলেন রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় – তিনি ক্রিন ইতিহাসের গবেষক ও লেখক। তাই তারে উপন্যাস পড়লে ইতিহাস পাঠের ফল হয়। গল্পসঙ্গ আছে যদিও তা খাটি হলেও নবীন নয়। তিনি বিছিমচন্দ্রেই জের টেনেছিলেন।

সাধারণ পাঠকের কাছে রাখাল দাসের উপন্যাস বোধ হয় 'ময়ৃখ' ছাড়া, যতটা সমাদর পাওয়া উচিত ছিল, ততটা পায়নি। সে দোষ হয়ত সম্পূর্ণ সাধারণ পাঠকের নয়।

তার পরে এলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ঐতিহাসিক ছিলেন না, ছিলেন ইতিহাস পিপাসু পাঠক এবং ভক্ত। আগেকার লেখকদের মতো দুরবীনের চোগ্রার মধ্যে দিয়ে কিংবা নাকে দ্রদৃষ্টির চশমা এঁটে ইতিহাস হাতড়াননি। যেন চোখে কনট্যাই লেন্স লাগিয়ে ইতিহাসকে হাতের নাগালে পেয়েছিলেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত শরদিন্দুর ঐতিহাসিক গল্পের কাল প্রসার। কোথাও গজের পরিবেশ গল্পরসের স্বাদ নট করে নি। দূরের দৃশাপটকে নিকটে এনে দূরের মানুবকে কাছের মানুব করতে পেরেছেন শরদিন্দু। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অসম্ভব আবেদনময় ঐতিহাসিক কল্পনা। এককথার হানাচিনির সুপক্ক আয়োজনে প্রকৃতই 'জলভরা সন্দেশ' হয়ে উঠেছে এগুলি। বন্ধিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে গুরুগন্তীর কারুকার্যরচিত পশ্চাৎপট, গুরুগন্তীর মেঘডম্বর ভাষা, অলৌকিক ও গুরুপাক প্রসঙ্গ-ডাবা-বিষয়, কল্পনার মন্দাক্রাস্তা হন্দ সব মিলিয়ে একটি অধরা জাঁকজমকপূর্ণ আড়ম্বরগামী রাজসভার সাহিত্যের জন্ম দেয়। শরদিন্দু অনেক কাছের মানুব। তাঁর গদা, তাঁর Style যেমন সুললিত তেমনি সুপ্রযুক্ত। দুরের মানুবকে কাছে টেনে আনে। কাছের নিবিড় আত্মিক বন্ধনকে সেকালের প্রেক্ষাপটে নিয়ে যায়। তাঁর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'। এছাড়া আছে 'কালের মন্দিরা', 'গৌড়মন্নার', 'তৃমি সন্ধার মেঘ' ও 'কুমারসম্ভবেয় কবি'।

বাংলায় প্রথম মৌলিক ডিটেকটিভ গল্প কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে লেখেন পাঁচকড়ি দে। অরিন্দম বসু এবং দেবেন্দ্রবিজ্ঞয় মিত্র-দাদা শ্বতর ও নাতজ্ঞামাই, এই দুজনের রহসাময় চিন্তায় আদানপ্রদানে জমে উঠেছে ডিটেকটিভ রস। অরিন্দমকে অনায়াসেই 'super slenth' চরিত্র বলা যায়। যেমন বলা যায় শার্লক হোমেসের দাদা মাইক্রফট হোমসকে। ব্যোমকেশ কিন্তু বিংশ শতাব্দীয় তৃতীয় দশকের বাঙালী যুবক। সুশিক্ষিত, মার্জিত, শালিত-ধী, মেধাবী, তীক্ল-দৃষ্টি, সংযত বাক্, কৌর্তৃকপ্রবল ও সহৃদয়। তার সঙ্গী অজিত-কল্পনা প্রবল, হৃদয়-বান ও বান্তবদীর্ণ। এই গুলগুলি তাকে ময়য়ী সুলেখকে পরিণত করেছে, কিন্তু সঠিক চিন্তক ও বান্তবচিন্তক তাকে কোনোমতেই বলা যায় না। শার্লক হোমসের যেমন ওয়াটসন, এরাকুল পোয়ারোয় যেমন হেন্টিংস। ডিটেকটিভ গল্পের প্রধান আকর্ষণ ডিটেকটিভের ব্যক্তিকে, তার আচরণে, বৃদ্ধি চাতুর্যে, এবং প্রত্যুৎপল্লমতিক্তে। ব্যোমকেশ অবশ্য ঠিক ডিটেকটিভ নয়। "ডিটেকটিভ শব্দটা বিচ্ছিরি, গোয়েন্দা শব্দটা আরো থারাপ, তাই নিজের খেতাব দিয়েছি সত্যান্ত্রেরী; ঠিক হয়নিং" ('সত্যান্ত্রেরী' গল্প)

শরদিশু কমবেশী ৩২ - ৩৩ টি বড়ো গল্প লিখেছেন ব্যোমকেশ ও অজিতকে নিত্র। বোমকেশের স্ত্রীর নামটি ও চমৎকার - 'সভ্যবতী'। 'অর্থমনর্থম' গজে ভালের প্রবাদ, অনুরাগও বিবাহের সূত্রপাত। ব্যোমকেশ শার্লক হোম্সের মত 'super human' নত্র। এরাকৃল পোয়ারোর মত 'মনস্তত্ব নির্ভর চিন্তাবিদ্' ও নয়। সে একেবার্ডই এই ক্রন্তুমির মধাবিত্ত, উদামী, যুক্তিবাদী, সূচিন্তক প্রতিভাবাদের সমন্বিতরপ। ভার শাশিত, অকথকে মন্তিষ্কটিতে যেভাবে মৌলিক ও উশ্লাবনী চিন্তায় ও সমাধানের সূত্র খেলা করে যায়, তাকে মধ্যবিস্ত বাঙালী সমাজ আগে দেখেনি। শরদিন্দুর অজিত চরিত্র ও ওয়াটসন অথবা হেন্টিংস এর প্রতিরূপ নয়। অজিত কল্পনা প্রবণ, অভ্যান, দরদী - মরমী দার্শনিক এবং ব্যোমকেশের প্রতিভার একনিষ্ঠ ভক্ত, -আৰু বল 'fan'। - অজিতের লেখার মাধ্যমেই ব্যোমকেশের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। তবে 'শৈল রহস্য' 'বিশুপালবধ' প্রভৃতি বড়ো গল্পে অজিতকে সরিয়ে শরদিন্দু শেষ দিকে নিজেই কলম ধরেছেন, ব্যোমকেশ চরিত্র শরদিন্দুর জনপ্রিয়তম চরিত্র এবং বিক্তপালবধ' ব্যোমকেশ পর্বেই শেব ও অসমাপ্ত রচনা। এখানে লেখার style ও technique ও অনেক অপ্রভাক্ষ নিরপেক্ষ ও অভিনব হয়ে উঠেছে। ব্যোমকেশের উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করলে দৃটি ভিন্নমুখী শ্রোত আমরা অনুভব করতে পারি। সভাত্রেধী, যে ক্রমাগত বৃদ্ধির খেলা খেলছে এবং ফাঁদ পাতছে অপরাধীকে মাত করতে এবং অপরাধী, যে বৃদ্ধি খটিচ্ছে তার অপরাধ মূলক চিন্তাকে সক্রিয় ও সাফল্যমন্ডিত করতে। নায়ক একজনই ব্যোমকেশ, সহনায়ক তথা supporter অজিত, খলনায়ক-খলনায়িকা প্রতিটি গল্পে বিভিন্ন এক বা একাধিক চরিত্র। প্রেম ভালোবাসা, দ্বন্দ্ব সংঘাত রোমান্স প্রিল সবকিছু এই গল্প গুলিতে মিলেমিশে রহসাজনক আবহ তৈরী করেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সতা তথা ন্যায়ের জয় হবেই — এটাই গলগুলির মূল theme। অন্যায় প্রাথমিক ভাবে সফল হলেও শেবরক্ষা – করতে পাত্রে না। অপরাধ প্রমাণিত হোক বা না হোক খলনায়ক কে বা কারা, বোমকেশের অপূর্ব বৃদ্ধিবলৈ তা চিহ্নিত হবেই।

অনুকৃপবাব্ (সভাত্রেবী ও করেন কবি কালিদাস) প্রফুলরার (পথের কাঁটা) থুড়ো মশাই দিগিন্দ্র নারারণ সিংহ (সীমন্ত হীরা) প্রতিবন্ধী যুবক ফণিভূষণ কর (অর্থমনর্থম), দেওয়ান কালীগতি (চোরাবালি), জামাই মণিলাল (দৃর্গরহস্য) ইত্যাদি বিভিন্ন গল্পে বিভিন্ন খলনারক বা নায়িকা বাবহৃত হয়েছে। নানা রকম স্বাদের খলনারক বা নায়িকা এবং বিভিন্ন পার্শ্ব চরিত্রের বৈচিত্রা ও নতুনত্বে এত্টুকু একঘেয়েমি আনতে দেরনা। একজন সার্থক অভিনেতা যেমন প্রতিটি চরিত্রের রূপদানের সময় নতুন নতুন সুপ্রযুক্ত ব্যক্তিত্ব ও style আমদানী করেন, শরদিন্দুর কর্নাও গল্পের ও চরিত্র সৃষ্টির

চমৎকারিত্বে ও নতুনত্বে প্রতিবারই অনাস্বাদিত ও অভূতপূর্ব হয়ে উঠেছে।

শরদিন্দু ভাবনায় তৃতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে লেখকের সমৃদয় রোমান্টিক উপনাস দাদার কীর্তি, বিষের ধোয়া, ঝিলের বন্দী, ছায়াপথিক, বলুমনের ওপার হতে, রিম্বিম, রাজদ্রোহী, মনচোরা, অভিজ্ঞাতক ও শৈলভবন। এর মধ্যে যেমন আছে সাধারণ সহজ সরল বাঙালী ঘরোয়া পটভূমি (দাদার কীর্তি), তেমনি অসম্ভব অকল্পনীয় সব দৃঃসাহসিক পশাৎপট, (ঝিলের বন্দী)। স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ীরোমান্সের অভিমুখ, ধরণ ধারণ, আদবকাদয়া, আচরণ বিধি, প্রকাশভঙ্গিমা, সবই পাল্টেছে। সামাজিক,অর্থনৈতিক ও কালগত এবং স্থানগত পরিবেশ পরিস্থিতি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে এইসব উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টিতে।

শরদিন্দু অম্নিবাসের অন্যান্য দুতিনটি খন্ডে গোরেন্দা ও ইতিহাস আশ্রিত গল্পছাড়া বাকী সমস্ত ছোটগল্পের সংকলন রয়েছে। এই গল্পগুলি বিভিন্ন ধরনের। অলৌকিক হাসাকৌতুক, প্রেম এবং সামাজিক। যেমন প্রেতপুরী, ভালবাসা লিমিটেড, নাইট ক্লাব, তন্ত্রহরণ, দস্তক্রচি, মাৎস্যন্যায়, যন্মিন দেশে ইজাদি। প্রেতপুরী বোল বছর বয়সে 'পৃষ্পপাত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত। শরদিন্দুর যেমন 'সভ্যান্ত্রবী' ব্যোমকেশ, তেমনি 'ভূতান্ত্রবী' বরদা চরিত্র। তাঁর ভূতুড়ে বাড়ির এ কল্পনা আশ্রয় করে কাহিনী 'প্রতিধ্বনি' ও 'অশরীরী'। 'শুন্য শুধু শুন্য নয়' ও 'সবুজ চশমা' fantacy জাতীয় রচনা । 'মায়াকুরঙ্গী' ও 'সতী' অতি, অলৌকিক কাহিনী। 'নিক্তবর' ও 'ফকির বাবা' occult জাতীয় গল্প। 'মরণ ভোমরা' ও 'রক্ত খাদক' ভৌতিক গল্প।

বাংলা সাহিত্যে শরদিন্দুর আর একটি অবদান হল কিশোর কাহিনী। 'ময়ুর
কূট', 'ঝিলম নদীর তীরে', 'উভর সংকট', 'সামন্তক', 'ভালুকের বিরে', 'পালা দিবীর
জোড়া রুই' ইত্যাদি প্রায় ২৪টি গল্প কিশোরদের জন্য লেখা। ছত্রপতি শিবাজীর খুদে
সাকরেদ 'সদাশিব' কে নায়ক করে তাঁর লেখা পাঁচটি বড়ো গল্প

সদাশিবের অগ্নিকান্ড (দু - খন্ড)

- " দৌডোদৌডি কাল্ড
- " হৈ হৈ কান্ড

এবং " ঘোড়া ঘোড়া কান্ড।

কিলোরদের জন্য লেখা প্রথম গল্প 'মোক্তার ভূত'। (২ রা পৌষ ১৩৩৯)। এই পর্যায়ের শেষ গল্প 'নন্দন গড়ের রহস্য'। (১১-ই শ্রাবণ, ১৩৭৬) – সদাশিবের পর্যায়ের আরও চারটি বড়ো গল্পের নামকরণ করেছিলেন শরদিন্দ্। কিন্তু সেগুলি লেখার আকারে সংগঠিত হতে পারেনি। খসড়া পর্যায়েই থেকে গেছে। এগুলি হল।

সদাশিবের রক্তারক্তি কান্ড

কেলেঙকারী কান্ড

বিদ্যুটে কান্ড মহামারী কান্ড।

শরদিন্দু লেখনীয় এই বিপুল জনপ্রিয়তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর অসাধারন বিচিত্র মূখী চিন্তাশক্তি, প্লটের বহুমূখীনতা, চরিত্রের অনবদ্য রকম ফের। বর্ণনার (narration) অনারাস প্রবহমানতা এবং ভাষা ও শব্দাবলীর 'প্রসাদগুণ', লেখনীর মৌলিকতা ও নিজস্বতা এবং উপযুক্তশব্দ প্রয়োগের কারুকার্য। তাঁর রচনা স্বচ্ছ সলিলা ঝরনার মতো, উপলবিক্ষৃদ্ধ, বন্ধুর, সমতল, শম্পশ্যামল বা উপজকা, সবকিছু মধ্যে দিয়ে বিচিত্র গতিতে বরে গেছে । রামধনুর সাত রং বিকীর্ণ করেছে। তাঁর লেখা কোথাও পৌনঃপুনিকতা বা একঘেরেঁমিতে আক্রান্ত নর। শরদিন্দু নিজে সবচেয়ে স্বাহন্দ ছিলেন ঐতিসাহিক উপন্যাস ও গল্পে। একথা তাঁরই জবানী থেকে আমরা জ্ঞানতে পারি। যদিও অন্য নানা ধরনের গল্প উপন্যাসও তিনি প্রচুর লিখেছেন। তাঁর ভাষা খাঁটি কলকান্তায়ো, যেমন তার আভিজ্ঞাতা, তেমনি তার কারিকুরি। প্রতিটি – গল্পই নতুনতর স্থাদ বহন করে আনে। সেখানেই জঁর নিজম্বতা ও সার্থকতা। প্রমধনাথ বিশীর ভাষায় "শরদিন্দু বাব্র প্রধান গুণ ঐতিহাসিক কল্পনা। বহু দুরকালের সামান্য ক্য়খানা ঘটনার কন্ধালের মধ্যে তিনি প্রতিভার মন্ত্রবলে প্রাণসঞ্চার করিতে পারেন।" যদিও ব্যোমকেশ কাহিনীই তাঁর জনপ্রিয়তম রচনা। গদ্য সাহিত্য ছাড়াও শরদিন্দ কমেকটি কবিঅসংকলন এবং নিজ কাহিনী অবলম্বনে সিনেমার চিত্রনাট্যও লিখেছেন। তবে তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। তৎকালীন সমাজ, পরিবেশ, যুগ, কালের পেকাপটে তিনি আধুনিক, আজও সমানভাবে তাঁর লেখা পড়তে আমাদের ভালো লাগে। আজও নবীন প্রজন্মের পাঠকদের কাছে তিনি একই ভাবে আদৃত। আজও তাঁর নানা গল্প উপন্যাস নিয়ে টিভি সিরিয়াল, সিনেমা হয়েই চলেছে। তাই তার বই বারং বার পাঠ করলেও একর্ষেরে লাগে না। তাই মনে হয় – গত শতাব্দীর অসম্ভব জনপ্রিয় এই কথাসাহিত্যিকের সৃষ্টি ও প্রতিভা নিয়ে কিছু ভেবে দেখা যেতে পারে।

# পাবলো নেরুদা ঃ কবি ও কাব্যিকতা

সৃপ্রিয় ধর ইংরাজী সাহিত্য বিভাগ

পাবলো নেরুদা চিলির জাতীয় কবি। নেরুদা জন্মেছিলেন ১২.৭.১৯০৪ গ্রীষ্টাব্দে, মারা যান ২৩.৯.১৯৭৩-এ। পাবলো নেরুদার আসল নাম নেকৃতালি রিকার্দা রেয়েজ বোসোয়াল্তো। পারালে তাঁর জন্ম। দক্ষিণ চিলির সীমান্তবর্তী একটি শহর তেমুকো। নেরুদার বয়স যখন দুই, বাড়ীর লোকদের সঙ্গে তেমুকো শহরে তিনি চলে যান। কৈশোর আর শৈশব নেরুদার ওখানেই অতিক্রান্ত হয়। জায়গাটি ছিল বনাঞ্চল, কিন্তু আরাউকো প্রদেশের ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ফলে চিলির অনেকেই তখন ঐ অঞ্চলে বন কেটে বসত তৈরীতে হাত লাগিয়েছিল। নেরুদার বাবা নতুন নতুন এলাকায় রেললাইন বসানোর কাজে যুক্ত হন। চতুর্দিকে জঙ্গল, তারই মাঝে তরু হয়েছে চাষবাস আর পত্তপালন, বন্য প্রকৃতির রহস্যময়তা নেরুদার মনে গভীর রেখাপাত করে। প্রকৃতির মুক্ত আবহাওয়ায় ছিল না সমাজের কোন কুসংস্কার, ধর্মের কোন গোঁড়ামি। সর্বব্যাপ্ত সংস্কারমুক্ত আবহাওয়ায় নেরুদা নিশ্বাস নিয়েছেন, যা তাঁর পরবর্তী জীবনভাবনায় দীর্ঘ ছায়া ফেলেছিল। বোলো বছর বয়স পর্যন্ত নেরুদার দিন রান্তি অতিবাহিত হয় তেমুকোতে, যেখানে সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা ছিল না বললেই চলে। দশ বছর বয়সে নেরুদা কবিতা লিখতে তরু করেন। বোলো বছর বয়স পর্যন্ত বয়সদার অবস্থান ছিল তেমুকোতে।

সান্তিয়াগোতে নেরুদা যখন পা ফেলেন তখন তাঁর বয়স বোলো অতিক্রম করছে। পড়াশোনা করতে নেরুদা এলেন সান্তিয়াগোতে, আর ঠিক এই সময়েই নেরুদার পরিপূর্ণ কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় একের পর এক ছাপা হতে থাকে নেরুদার কবিতা। নেরুদা কিন্তু পিতৃদন্ত নামে কবিতা লেখেননি। নেরুদার সময়ে চেকোশ্রোভাকিয়ায় একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক ছিলেন। নাম – ইয়ান নেরুদা। নেরুদা উপাধি সেই সূত্রে। পাবলো নেরুদা তাঁর নিজের দেওয়া ছয়নাম।

পাবলো নেরুদার বয়স যখন কৃড়ি, ১৯২৪ গ্রীষ্টাব্দে, তাঁর দ্বিতীয় কবিতার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কবিতার বইটির নাম 'কৃড়িটি প্রেমের কবিতা' (Veinte poemas de amor)। এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নেরুদার কবি-কৃতি দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এর ঠিক অব্যবহিত পরেই প্রকাশ পায় তাঁর একগুছে কবিতা। ১৯২৭ থেকে তরু হয় নেরুদার বিছিয়ের জীবন। দীর্ঘ পাঁচবছর কখনো ব্রহ্মদেশ, কখনো রেঙ্গুন, কখনো কলমো তাঁকে ছুটে বেড়াতে হয় কৃটনৈতিক চাকরির দায়ভার সামলাতে। মাতৃভাষা স্প্যানিশে কথা বলতে পারছেন না। এমন কেউ নেই পাশে যার সাথে

নিজ্ঞর মাতৃভাবার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন। বিচ্ছিন্নতা, একাকীত্বের দিন মাতৃভাব অভিজ্ঞতার ফসল 'পৃথিবীতে বাসা' (Residencia eu la tierra)। এই অব্যক্তরীর প্রথম খন্ড ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে প্রকাশ পার।

১৯৩৪ পাবলো নেরুদার কবিতার ইতিহাসে পালাবদলের এক নতুন অধ্যায়ের সুক্রমকা। নেরুদা চিলির কমাল পদে অধিষ্ঠিত হয়ে এই সময়ে স্পেনের বার্সিলোনা এবং পত্র মান্তিদে বসবাস করেছিলেন। এখানেই নেরুদার জীবনের এবং কবিতার ক্রমকল, নৃত্তিভঙ্গির পালাবদল ঘটতে শুরু করে। জনসাধারণের জীবন ও জীবন সক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে কাব্যরচনায় ব্রতী ছিলেন একদল কবি যাদের সঙ্গে আটারই নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল পাবলো নেরুদার। এই কবিগোষ্ঠাই নেরুদাকে ক্রমনীতি, সমাজ, দেশ ও দেশজ সমস্যা সম্পর্কে আকৃষ্ট করে তোলে।

এই কবিগোষ্ঠীর কেন্দ্রে ছিলেন ফেদেরিকো গার্ষিরা লর্কা, স্পেনের গৃহযুদ্ধে
কিনি নিহত হয়েছিলেন। লর্কার হত্যার বিরুদ্ধে নেরুদা প্রতিবাদে মৃথর হয়েছিলেন,
ভক্তকিত স্বরে আবেগময় প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, এবং তার ফলে কম্সালের পদ
হারাতে হয়।

কিন্তু থেমে থাকার মানুষ ছিলেন না নেরুদা। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নেরুদা চিলির আইনসভা সিনেটের সদস্যপদ পাবার যোগ্যতা অর্জন করেন এবং কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন। কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদানের ফলশ্রুতি হিসেবে সাধারণ মানুষ এবং শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সখাতা গড়ে ওঠে, সাধারণ মানবের জীবনযন্ত্র ণার সাধী হয়ে ওঠেন। চিলির রাজনৈতিক আকাশে তখন আরেকটি ঐতিহাসিক ঘটনার কালো মেঘ। চিলির রাষ্ট্রপতি পূর্ব ইউরোপের বহু দেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। সাধারণ মানুষের স্বার্থের কথা একবারের জনাও ডিনি ভাবলেন না। নেরুদা নিশ্চপ হয়ে রইলেন না। প্রকাশ্যে রাষ্ট্রপতি ভিদেলার সমালোচনা করলেন। নেরুদাকে গ্রেণ্ডারের প্রঝৃতি গুরু হলো। আত্মুদোর্পন করলেন নেরুদা। আত্মুদোপন পর্বে সরকারের সমালোচনা করে নেরুদা লেখেন কিছু ছড়া। সেগুলি প্রাচীরপত্তে লেখা হয়ে মানুষের মূখে মূখে ছড়িয়ে পড়ে। বহু কবিতার তাঁর এই আত্মগোপন পর্বের ইতিবৃত্ত ধরা পড়েছে। স্বাদশে প্রভাবর্তনের পরে তিনি যেসব কবিতা লিখলেন সেই সব কবিতার বিষয়বন্তু, কবিতা লেখার ভঙ্গি, প্রকরণ অন্য সব কবিতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই সময়ের কবিতায় নেরুদা অনেক স্পষ্টভাষী, উচ্চকিত। যা কিছু বলছেন সবই খুব উঁচ গলায় বলছেন, ফলত কবিজর ভাষাও বদলে গেলো। খনি মজুরদের বভিতে, রাজনৈতিক জনসভায় নেরুদা কবিতা পড়তে গুরু করলেন।

উচ্চকিত ভঙ্গিতে কবিতা লিখলেও প্রায় এই সময়েই নেরুদা সহজ, সরল ভাব ও ভাষায় কবিতা লিখলেন, যেসব কবিতায় সমারোহ নেই, শ্লোগানধর্মীতা নেই, উচ্চকণ্ঠের ভাষণ নেই। এইসব কবিতায় একটা সাংগীতিক আবহ ব্যাপ্ত হয়ে আছে। মতিলদে উক্ততিয়াকে বিয়ের পর নেরুদা লেখেন অজস্র প্রেমের কবিতা, যদিও বিয়ের আগেও তিনি প্রেমবিষয়ক অনেক কবিতা লেখেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমকে উপজীবা করে প্রকাশ পায় 'প্রেম বিষয়ক সনেটশতক' (Cien Sonetos de amor)।

জীবনের প্রতিটি বাঁকে নেরুদার কবিতা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা, তাঁর বিভিন্ন দেশের স্রমণবৃত্তান্ত, রাজনৈতিক জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাত এবং সর্বোপরি বাক্তিগত জীবনের সুথ দুঃখের কথামালায় একেবারে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ পায়। পঞ্চাশোত্তর হওয়ার পর থেকেই নতুন প্রকরণে এবং বিষয়বস্তুতে তাঁর কবিতা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

১৯৭০, চিলির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। সালভাদর আলেন্দে চিলির রাষ্ট্রপতি পদে অভিবিক্ত হলেন। নেরুদাকে ঐবছরই প্যারিতে রাষ্ট্রদৃত করে পাঠানো হয়। ১৯৭১ সালে পাবলো নেরুদা নোবেল পুরস্কার পান। এর অল্প কিছুদিন পরেই নেরুদা রাষ্ট্রদৃত পদে অবসর নিয়ে কৃষ্ণবীপে শান্তিতে অবসর জীবনযাপন করতে যান। কালবাাধিতে আক্রান্ত নেরুদা এখানেই তাঁর স্মৃতিকথার চূড়ান্ত রূপ দেবার প্রভূতিপর্ব শুরু করেন। স্প্যানিশ ভাষায় স্মৃতিকথার নাম Confiesoque he vivido: Memorias। স্মৃতিকথাটি ১৯৭৪ সালে নেরুদার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

নেরুদা তথন মৃত্যুশ্যায়। চিলির কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রপতি আলেন্দকে ক্ষমতাচ্যুত করতে দেশী-বিদেশী সাম্রাঞ্জাবাদের প্রভাক্ষা সমর্থনপৃষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সমাবেশ ক্রমশ সংহত হচ্ছে। দৌবাহিনীতে বিদ্রোহ, সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ আলেন্দের শাসনব্যবস্থার ভিত্-কে নাড়িরে দিলো। আক্রান্ত হলো লা মোনেদা প্রাসাদ। বীরের মতো যুদ্ধ করে আলেন্দে মৃত্যুবরণ করেন। আলেন্দের মৃত্যুর বারো দিন পরে পৃথিবী হেড়ে চলে যান পাবলো নেরুদা। চিলিতে তথন জঙ্গী শাসন। কঠিন, কঠোর, অমানবিক জঙ্গী শাসনের নাগপাশের মধ্যেও নেরুদার শবযাত্রা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর আকার নিয়েছিল। বলা যেতে পারে নেরুদার শবযাত্রাই জঙ্গী শাসনের বিরুদ্ধে চিলির মানুবের প্রথম সংগঠিত বিক্ষান্ত মিছিল। ক্ষিপ্ত জঙ্গী শাসকগোলীর ভাড়াটে গুন্ডার দল সান্তিয়াগোতে নেরুদার বাড়ী আক্রমণ করে। আন্তনের লেলিহান শিখার পূড়তে থাকে নেরুদার অসংখ্য বই, কবিতার পান্ড্রলিপি। যুগে যুগে ফ্যাসিন্তরা এভাবেই বই, দলিল দন্তাবেন্ড, তথ্যসমৃদ্ধ কাগন্তপত্র এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন লাগার, আগুনের উৎসবে মেতে ওঠে, পূড়ে যার মানবসভাতার ইতিবন্ত।

আঙ্গিক ও বিষয়বন্ধুর ক্ষেত্রে নেরুদা সদা পরিবর্তনশীল থেকেছেন, এবং একারলে নেরুদাকে বলা হতে কবিতার পিকাসো। নেরুদা সাহিত্যের অনেক পরিমন্ডল ভেঙেছেন, ভেঙে আবার গড়েছেন। Residence on Earth রচনাটিকে সমালোচকরা বলেন্ডেন devastatingly pessimistic। তিনখন্ডে সমগ্র রচনাটি বিভক্ত। প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৯৩৩, ১৯৩৫ ও ১৯৪৭। দেখা যাছে ছিতীয় ও তৃতীয় ভাগ প্রকাশের বাবধান বারো বছর। মধ্যবয়সী এক কবির হতাশা ও নৈরাশ্যের মান্তারপিস হলো Residence on Earth - (Residence en la tierra)। বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন দেশে বইটির পান্ড্রলিপি হস্তান্তরিত হয়েছে, কিন্তু প্রকাশিত হয়নি। শেবে নেরুলার বাক্তিগত উদ্যোগে এবং চিলির পুরনো প্রকাশক নাজসিমেন্তো-র সহযোগিতায় মান্ত একশ বই প্রকাশ পায়। প্রকাশের সঙ্গে কবিতার জগতে একটি নতুন ধারা প্রকাশিত হয়, যা নেরাদিজিম (Neradism) নামে খ্যাত।

দিতীয় মহাযুদ্ধের দাদামা বেজে উঠলে নেরুদার কবিতা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল ত অভিজ্ঞাতার সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ১৯৪২ সালের সেন্টেম্বর মাসে, মেক্সিকো সিটিতে এক জন সমাবেশে নেরুদা পাঠ করলেন Canto a Stalingrad বা Song of Stalingrad। দেশ ছেড়ে দেশান্তরে যেতে হয় নেরুদাকে, কিন্তু দেশতাদাের আসেই তৈরী হয়ে যায় নতুন আর এক কবিতা : New song of love to Stalingrad। এই পর্বের কবিতা সম্বন্ধে নেরুদা ঘোষণা করলেন : Poetry is like bread, and it must be shared by everyone, the men of letters and the peasants, by everyone in our vast, incredible, extraordinary family of man. I confess that to write simply was my most difficult task। ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা, জর্জ গিলেন ও রাফায়েল আলবার্তি নেরুদার কবিতা সম্পর্কে বললেন প্রথম বান্তবতাবোধই তার কবিতার প্রামাণ্য শাসক চেতনা হিসেবে সক্রিয়। ফ্যাসিবাদ যে শিজের শক্র, মানবজাতির শক্র এই দ্বির বিশ্বাসে নেরুদা দ্বিত ছিলেন।

জাঁ পল সার্ত্রেকে ১৯৪৬-এ নোবেল প্রস্কার দেওয়া হলো, কিছু সার্ত্রে নেরুদাকে কেন নোবেল প্রস্কার দেওয়া হলো না এই প্রশ্নে প্রজাখান করলেন প্রস্কার। তবে নোবেল কমিটি শেষপর্যন্ত ১৯৭১ সালের ২২শে অক্টোবর পাবলো নেরুদাকে নোবেল প্রস্কারে ভৃষিত করে। ১৯৩৭ সালে নেরুদা পেয়েছিলেন আলিন প্রস্কার।

নেরন্দার কবিতা নিছক দেহচর্চা, নারীশরীরবিষয়ক কবিতা হিসেবে যেসব সমালোচক চিহ্নিত করতে সদা বান্ত, তাঁরা যে কডটা আন্ত তা নেরুদা নিজেই বাক্ত করেছেন: "আমি থিওক্রিটাস নই: আমি জীবন পেয়েছি, জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, জয় করেছি, চুম্বন করেছি জীবন, তারপর খনির ভেতর দিয়ে গুহার মধ্যে হেঁটে গেছি, কেমন করে মানুষ জীবন প্রতিপালন করে তা দেখবার জনা..." "রাত্তে আমি কোন নির্জনতা অনুভব করিনা পৃথিবীর অন্ধকারের মধ্যে,

আমি মানুষ, সংখ্যাতীত মানুষ। আমার কঠন্বর হলো নির্ভার শক্তি

যা স্তন্ধতা অতিক্রম করে
অন্ধকারে জন্ম নিতে পারে।
মত্যু, যদ্ধনা, ছায়া, তুবার বৃদ্ধি
হঠাৎ শব্যবীজের উপর নেমে আসে।
এবং মানুষজাতি মনে হয় সমাধিস্ত।
কিন্তু শব্যকণা মাটিতে ফিরে আসে।
এর রক্তিম অশান্ত হাত
ভন্নতার মধ্যে ঢুকে যায়।

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আসে আমাদের পুনর্জন্ম।"

কমিউনিষ্ট কবি হিসেবে বিশ্বব্যাপী নেরুদার খ্যাতি আজ সর্বজনবিদিত। মানবতাবোধ তাঁর কবিতার গভীর ইংগিতবাহী। বলিষ্ট জীবনবোধ, উপনিবেশকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল মানবাঝার ইতিবাচক ঘোষণা নেরুদার কবিতার সক্রিয় রক্ষাক্বচ, স্তাক্র বিবেক। আন্তর্জাতিক সাহিত্যাকাশে পাবলো নেরুদা একজন বড় মাপের কবি হিসেবে স্বীকৃত, তিনি বৃত হয়েছেন স্পেনীয় ভাষায় কবিতা রচনার ক্ষেত্রে একজন মহান কবি হিসেবে। ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা, জর্জ গিলেন ও রাফায়েল আলবার্তি নেরুদার কবিতা সম্পর্কে তাঁদের স্পষ্ট অভিমত জানিয়ে ঘোষণা করলেন: Constitutes without dispute one of the most authentic realities of poetry in the Spanish language today। অন্তেন এই সময়টাকে বলেছিলেন: 'hour of crisis and dismay' — এবং এরক্স সময়ে লোরকা প্রমুখ কবিদের অভিমত অবশাই সাহসী মনের পরিচয়জ্ঞাপক, সন্দেহ নেই। 'Here I am' — এই শিরোনামে পাবলো নেরুদার জবানবন্দী তাঁর কবিতা ও জীবনের এক জ্বন্স ভাষা।

Why Such harsh machinery?
Why, to write down the stuff
and people of everyday,

must poems be dressed up in gold, in old and fearful stone?

I want verses of felt or feather
Which scarcely weigh, mild verses
with the intimacy of beds
where people have loved and dreamed,
I want poems stained
by hands and everydayness.

Dont be afraid of sweetness.

With us or without us,
Sweetness will go on living
and is infinitely alive,
forever being revived,
for it's in a man's mouth,
whether he's eating or singing,
that sweetness has its place.

পাবলো নেরুদার কবিতার সামগ্রিক চেহারাটা সম্ভবত এই কয়েকটি পংক্তির মধ্যে দৃষ্টান্তিত হয়ে আছে। নেরুদার যে কবিতাটি থেকে পংক্তিগুলো উদ্ধৃত হলো সেই কবিতাটির নাম Sweetness, Always। অনুবাদক Alastair Reid। মনোযোগী, উৎসাহী পাঠক জীবনবাধ, মানসিকতা, প্রকাশভঙ্গী, কবিতার শরীরে কাব্যিক আবহনির্মান ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর কবি রবার্ট ফ্রন্ট-এর Provide, Provide নামক কবিতাটির সঙ্গে নেরুদার Sweetness, Always-এর জীবনবােম্বের একটি তুলনামূলক আলোচনায় রতী হতে পারেন। সাহিত্যে এরকম সেতৃ পারাপার, সেতৃ নির্মান চলেছে আবহমানকাল ধরে নিরন্তর, নিরবধি। "Better to go down dignified" - রবার্ট ফ্রন্ট Provide, Provide, -এর কবিতার এই পংক্তিটিতে পাবলো নেরুদার জীবন, জীবনদর্শন এবং কাব্যিকতার ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে। এভাবেই বােধহয় একজন কবি অজান্তে আরেকজন কবির জীবনভাষ্য রচনা করে যান।

### সংকারাঃ

হেমন্ত ত্ৰিপাঠী সংকৃত সাহিত্য বিভাগ

সংকার শব্দ সম্- উপসর্গপূর্বক কৃ-ধাতোঃ ঘঞ্ প্রত্যায়েণ নিম্পণ্ডিঃ জায়তে । যস্যার্থঃ পরিষ্কনণমান্তি । ইয়ং পরিষ্করণম্ ন কেবলম্ শরীরস্য অপিতৃ আত্মিকল্যাণায় ব্রিরমানং ধার্মিক বিধিবিধানম্ অন্তি । তন্মাত্ সংকার পদেন শিক্ষা, সংকৃতি, প্রশিক্ষণম্, তদ্ধিঃ, পরিছরণম্, আভ্ষণম্ ইত্যাদরঃ অর্থাঃ সংগৃহাত্তে । উচাতে চ "আত্মশরীরান্যতরনিঠো বিহিত ক্রিরাজন্যেততি।শয় বিশেষঃ সংকার"।

# সংকারাণাম্ প্রয়োজনম্

সংকারেনৈব শিশো মানবভায়াঃ প্রথমোতৃবোধঃ জায়তে । সংকারবিধিনা মনুষ্য সংস্তো ভবতি মনুষ্স্য সমগ্থ জীবনমভিব্যাপ্য সংকারাঃ প্রতিতা সন্তি। সংকারাণামনুষ্ঠাণেন মনুষ্যম্য মনসি পবিত্রতাভাবঃ আগছেতি । যথা দৃষিতজ্বস্য সংকারক দারা সর্বত্র বিনিযোগঃ সম্ভবতি তথৈব সংকারা ণামনুষঠাণেন মনুষ্যস্য সর্বেষু কর্মধৃ অর্হতা আগচ্ছতি । সংস্কারঃ আত্মাভিব্যন্তে মাধ্যমো ভবতি । সংস্কারাণাং ভৌতিকমুদেশ্যং নি -ধান্য পত - সম্ভানদীর্ঘজীবন - সম্পত্তি - সমৃদ্ধি - বৃদ্দিরু চ অন্তর্নিহিতং ভবতি । সংকারণামনুষ্ঠানেন মনসি দয়া - অস্য়া -কমা-শৌচ - অনার্জভাবাঃ আগচ্ছত্তি । তদ্পরিণামরূপং চ মনুষ্যস্য ব্যক্তিত্বং নির্মিতং थवि । सनुना<sup>()</sup> - "এতन्त्रिन् विषद्य উरू

देविनिदेकः कर्मीछः शूरैनानित्यकानिर्विजनानाम् । কার্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবণঃ প্রেত্যকেহ চ।।

অর্ণাং (এবেদম্লত্ট্রিভিকেঃ পুন্যৈঃ ওতৈর্মন্ত যোগাদিকর্মডিঃ বিজ্ঞাতীনাং গর্ভধানাদিশারীর সংস্থারঃ কর্তব্যঃ । পাবনঃ পাপক্ষয় হেড়ঃ । প্রেত্য পরলোকে সংস্কৃতম্য যাগদিফল সম্বন্ধাৎ । ইহলোকে চ বেদাধ্যয়নাদ্যধিকারাদ্ এব । সংক্ষারঃ ভবতি ষোড়শবিধাঃ। তে যথা

- (১) গর্ভাধানসংস্থারঃ (২) পুংসবন সংস্থারঃ
- (৩) সীমন্ডোলুয়ন সংকারঃ (৪) জাতকর্মসংকারঃ
- (৫) নামকরণসংক্ষারঃ (৬) নিজ গণসংক্ষারঃ (৭) অনুপ্রাশনসংক্ষারঃ
- (৮) চূড়াকরণসংক্ষারঃ(৯) কর্ণডেদসংক্ষারঃ
- (১০) উপনয়ন সংকারঃ (১১) বিদ্যারশ্বসংকারঃ (১২) সমবর্ত্তনসংকারঃ (১৩) বিবাহসংক্ষারঃ (১৪) বানপ্রস্থসংক্ষারঃ (১৫) সন্মাসসংক্ষারঃ (১৬) অন্তোষ্ঠিসংক্ষারঃ

(১) গর্ভাধানসংক্ষার ঃ

যশ্মিন কর্মনি পুরষঃ দ্রীয়োনৌ ক্লেত্রে স্ববীজস্থাপনং করোতি তদেব কর্ম গর্ভাধাননামা পরিচীয়য়তে । যথোক্তং বীরমিত্রোদয়স্য সংক্ষারভাগে (০) গর্ভ আবীষতে যে ন কর্মনা । অতঃ গর্ভধানং তস্য নাম । যথা " নিষিক্রো যন্ প্রয়োগেন গর্ভঃ সংধার্যতে দ্রিয়া ।
তত্কর্মসম্ভবং নাম কর্ম প্রাপ্তং মনীষিভিঃ ।।

(২) পুংসবনম্-সংকার ৪

গর্ভধারনস্য নিচিয়ানন্তরং গর্ভস্থ নিশোঃ পৃংসবনাসংস্কারঃ ক্রিয়তে । পৃংসবনসংস্কারানুষ্ঠানস্য অয়মেবাডিপ্রায়ো ভবতি যৎ " পুমান্ যেন সংস্কারেন জায়তে তৎ পৃংসবনম্ "। যথোক্তং শোনকেন (a) " পুমান্ প্রস্থতে যেন কর্মনা তৎ পৃংসবনমীরিতম্ ।"

- (৩) সীমন্তোনুয়নসংকারঃ
  সীমন্তোনুয়ন সংকারস্য স্বরূপং নিবন্ধকারৈঃ প্রতিপাদিতম্ যথা (৫) "সীমন্ত উন্নীয়তে
  যন্মিন কর্মনি তৎ সীমন্তোনুযমিতি কর্মনামধেয়ম্ । যাজ্ঞবন্ধেন (৬) উল্ডঃ 'ষঠেঅইমে বা সীমন্তঃ।
- (৪) জাতকর্ম সংকার ঃ
  জাতকর্ম সংকারস্যার্থঃ জাতস্য শিশোঃ কর্মসংকারো জাতকর্ম ইতি ।
  মাতৃগর্ভাৎ সদ্যো জাতং শিশুং দৃষ্টা স্বপিতা তস্য রক্ষার্থং কিঞ্জিৎ কর্ম করোতি ।
  বিষ্ফুনা (१) উক্তঃ " জাতকর্ম ততঃ কুর্বাৎ পুত্রে জাতে যথোদিতম্ ।
- (৫) শামকরণ সংকার ঃ

ব্যাক্তিগত নামানুসারেণ ব্যাক্তিঃ স্বকর্মানুতবং করোতি । নামাকরণসংস্কার ধার্মিকঃ আবশ্যকন্ট । নামেব মনুষ্যস্য কীর্তিঃ লভতে তর্হি নামাকরণ সংক্ষারস্য প্রয়োজনং বহুপত্তিতাঃ স্বীকৃতম্ । গৃহ্যসূত্রানুসারেন শিশোঃ নামকরণং দশমদিবসে ক্রোন্স নিবসে ভবেং ।

(b) <u>নিক্রমন সংকার ৪</u>

শিতনাং শৈশবকালস্য প্রত্যেকং ক্ষণমূলতেঃ প্রতীকরূপম ।

অত্পিতৃবকুপরিবারাণাং চ হর্ষানন্দ স্যাবসরে ভবতি প্রত্যেক ধার্মিক সংস্কারা

অনুতানম্। প্রসৃতি গৃহস্য কার্যকাল সমাপ্তানস্তরং শিশোঃ বাহাজগতঃ সংসারস্য

চ দর্শনায় বর্হীনক্রমনং ভবেত । তস্মিন্ সময়ে শিশোঃ রক্ষার্থং দেবতার্চ্চনাদি কর্ম কর্তব্যম্। অস্য বিধিবিধানং বহুপ্রাচীনকালাৎ ভবতি । পারস্করগৃহ্যসূত্রে (৮) 'তচ্চক্ষ্মের্ব হিতম্' ইতি সামান্যমন্ত্রানাং প্রয়োগঃ দৃশ্যতে । চতুর্থেমাসি নিক্রমন সংক্ষার করনীয়ম্ ।

#### (৭) অনুপ্রাশন সংস্কার ঃ

অনুপ্রাশন সংকার শিশু জীবনস্য একং মহত্বপূর্ণং সোপানম্ । জন্মন আরভ্য মাতৃঃ স্তন্যপানং কৃত্বা জীবনযাপনং করোতি । যঠে সপ্তমি মাসি বা শিশুঃ শরীরপৃষ্ঠার্থমন্নং ভূঙ্ভে গৃ্থুতঃ (১) কথ্যতি — " বন্নাসঞ্চৈনমন্নং প্রাশয়েরুধু হিতঞ্চ "

#### (৮) চুড়াকরণসংক্ষার ঃ

ধর্মশান্ত্রনিরমানুসারেণ ব্যক্তেঃ দীর্ঘায়ৄঃ সৌন্দর্যঃ ক্ল্যানাদীনামভিবৃদ্ধ্যর্থময়ং
চূড়াকরণসংস্কারো ভবতি(২০) । চূড়াকরণশনঃ কর্মনামধের্যম্ । চূড়ায়ঃ করণম্,
চূড়ার্থং করণম্, চূড়া ক্রিয়তে ইতি যন্মিন্ । চূড়াকরণংনাম চৌলকর্ম, চূড়াকরনং
ধার্মিকং দীর্ঘায়ুয়ুক্তং চ ভবতি । যদি চূড়াকর্ম ন স্যাৎ তহি আয়ৄঃক্লয় ভবতি ।

## (৯) কর্ণভেদ সংকার ঃ

কর্ণভেদ সংস্কারঃঅতীব প্রাচীনকালাদ্ প্রচলিত । অলভারাদীনাভ্ষনামাং ধারনার্থমঞ্চাচ্ছেদনমাবশ্যকম্ । কর্ণয়োঃ সৌন্দর্যবর্জনার্থং কর্ণভেদনমাবশ্যকম্ । বহুকালাদ্ প্রচলত্যেব । ধার্মিকদ্ট্বা রোগাদিভ্যঃ মুক্ত্যর্থং কর্ণচ্ছেদন মাবশ্যকম্ । যথোকং সুক্রতেন (২২) ।

## (১০) উপনয়ন সংকার ৪

বালকস্য পিতা বালকং নীত্বা গুরোঃসমীপং গচ্ছেৎ । তত্র গুরুঃ তমুপনীয় স্বগৃহে স্থাপয়েৎ । অর্থবিবেদে অস্মিন্ বিষয়ে উচাতে (১২) যথা - "উপনীয়মানো, ব্রস্মচারিণম্" ব্রাক্ষণাদি - প্রভৃতিবর্ণনাং উপনয়নসংস্কারঃ ভবতি । ব্রাক্ষনস্য অষ্টমবর্ষে উপনয়নস্য মৃধ্যকালঃ ।

### (১১) বেদারম্ভ সংক্ষার ঃ

গৌতমঃ সংস্কারের বেদারন্তং স্বীকরোতি । সঃ চত্বারি বেদব্রতানি স্বীকরোতি । তদেব আশ্বলায়নেনাপি (>০) অন্যথা স্বীকৃতম্ । অয়ং সংস্কারঃ কেবলং বিজেভ্যঃবিধিয়তে । উপনয়নানন্তরমেব পবিত্রতমগায়ত্রী মন্ত্রাধ্যয়নেন সাকং বেদাধ্যমনং প্রারভ্যতে ।

#### (১২) সমাবর্তন সংকার ঃ

সমাবর্ত্তনশনস্যার্থঃ মিত্রমিশ্রেন (১৪) স্পন্তীকৃতঃ । যথা - তত্র সমাবর্ত্তনং নাম বেদাধ্যয়নানন্তরং গুরুচকুলাদ্ স্বগৃহাগমণম্ । ব্রহ্মচর্ষমেকং দীর্ঘসূত্ররূপং ভবতি ।

#### (১৩) বিবাহসংস্কার ঃ

মানবস্য সম্পূর্নজীবনস্য সংস্কারক্ষেত্রং ভবতি । এতেন সংস্কারেণ গার্হস্থাজীবনং পরিপাদ্যতে । ঋক্বেদে<sup>(১৫)</sup> অথর্ববেদে<sup>(১৬)</sup> চাস্য স্পষ্টাভিব্যক্তিঃ প্রাপ্যতে । পিতৃঋণপরিশোধনার্থং বিবাহসংস্কারস্য আবশ্যকতামন্তি ।

#### (১৪) বাণপ্রস্থার ঃ

পঞ্চবিংশতিবর্ষপর্যন্তং গৃহস্থ্যশ্রামে নিবাসং কৃত্য মানবো নিবৃত্তিমার্গং প্রতি গস্তুমিচ্ছতি । ধর্মস্য মোক্ষস্য সাধনার্থমন্মিল্লাশ্রমে প্রবিশতি মনুষ্যঃ। তদর্থং অরন্যং গত্যা চিন্তং করোতি ।

#### (১৫) সন্যাস সংকার ঃ

পঞ্চবিংশতিবর্ষপর্যন্তং বাণপ্রস্থাশ্রামে জনঃ সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিশতি । সন্ন্যাসমার্গে পুরুষঃ লোকে সর্বানি বস্তুনি পরিত্যজ্ঞা লোককল্যানকার্যেষু নিরতঃ সন্ স্বজীবন্যাপনং করোতি ।

# (১৬) <u>অন্তোষ্টিসংকার</u>ঃ

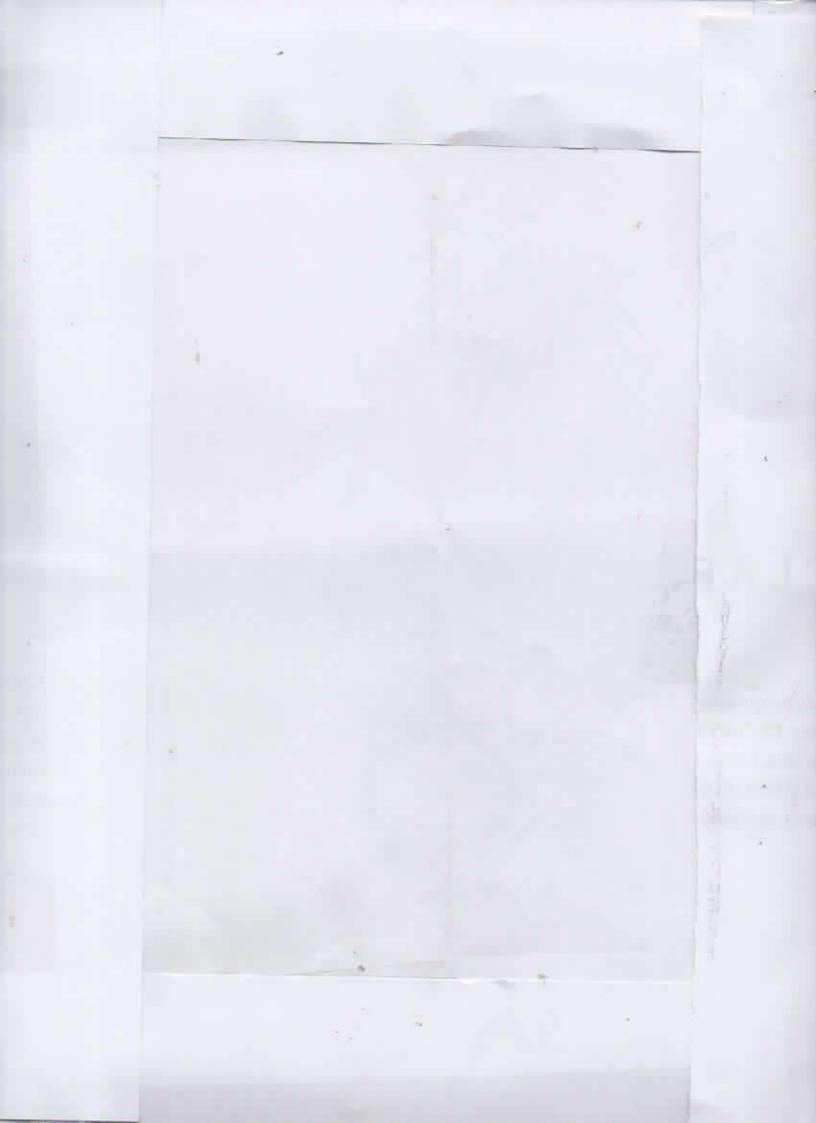
হিন্দুজীবনস্যান্তিমসংকারো ভবতি অন্তোষ্টিঃ যেন সংকারেণ সহ তস্যান্তি মজীবনং সমাপ্যতে । অত্মাদ্ সংকারাদ্ প্রস্থানানন্তরং পরলোকগতাং গতিং সম্যক্ বিচিন্ত্যাধ্মন্তিসংকার ক্রিয়তে ।

বৌধাযনাপিতৃমেধসূত্রে (২৪) উচ্যতে "জাতসংস্কারেন ইমং লোকমথিযজতি, মৃত সংকারেন অমুং লৌকম্ " । অতঃঅস্য সংকারস্য অনুষ্ঠানং সাবধানতয়া ক্রিয়তে ।

#### णिश्रनी ३-

- ১। মনু স্মৃতি ২/২৬
- २। क्वक २/२७
- ७। वी.मि. मध् ख ., পृ १ ১৪১
- 8। रेननकः, मर थ. न् १ ১७७
- ए। वी. मि मध् ख . श् ১१२
- ७। याख्य न्यृष्ठि ১/১১
- १। विख्. न्यृष्ठि शृह ১৮१
- ৮। भा, ग्. म् 3/39/8-৫
- ৯। সূক্রতে , শরীরস্থানে, ১০/৬৪
- ১০। আৰ. গৃ. সূ, ১/১৭/১২
- ১১। সৃশ্রুতঃ, শরীরবস্থানে-১৬/১
- ১२। जर्थर्वत्वरम, ১১/৫/৬
- ১৩। আশ্ব. গ্. সৃ , প্ ৬৩
- ১৪। वी. मि मर ख, शृ १७८
- ३৫। बारचाम, ३०/४०
- ১৬। व्यथनंतिम, ১৪/১/২
- ১৭। व्हो.शि.स्म. मृ ७/১/८

Section II Social Science



# VALUE OF PHILOSOPHY

Dr. Aditi Bhattacharya Dept. of Philosophy

P - Profoundity

H - Humanity

I - Ideology

L-Love

O - Originality

S - Speculation

O - Orientation

P - Possibility

H - Holisitic

Y - Yet to be found

I was pondering over how to start my essay on the value of philosophy. My little daughter while flipping through the pages of her chemistry book suddenly took her pen and playfully wrote down something on my copy. I found that in her playful mood she had analysed the word 'philosophy' in the above way. To my surprise I discovered that my daughter had written those very words which are considered as the 'Key words' of philosophy and they also reveal the uniqueness of philosophical knowledge. I got the idea how to unwrap the hidden treasures of philosophy.

The etymological meaning of the word 'philosophy' is 'love for knowledge' — it aims at knowledge which gives unity and system to the body of sciences. That is why it is known as the 'Mother of all sciences'. The approach of philosophy is speculative while that of science is factual. Speculative approach is based on guessing, that have been formed without knowing all the facts. The task of philosopher is to keep alive that speculative interest in the universe which is apt to be killed by confining ourselves to the definitely ascertainable knowledge based on facts. Science has to borrow this speculative approach of philosophy in order to

widen its spectrum. Concentration on truths based on facts poses a 'limit' to the science, so it has to cross this limit. By forming 'hypothesis' it goes beyond the limit and thus steps into the speculative world of philosophy. Science is also indebted to philosophy for the basic logical laws like 'Law of Identity', 'Law of Contradiction', 'Law of Exchuded Moddle' etc. which form the basis of any sort of scientific enquiry. Moreover, philosophy examines critically the principles employed in sciences, the essential characteristics of philosophy is criticism and it teaches science to be critical in its approach.

The questions raised by philosophy are profound and original. 'Is the universe a dance of blind atoms or there is a difinite plan or purpose behind it?'; 'Is consciousness a transitory accident on this small planet of ours or is it a permanent feature of the universe?'; 'Have good and evil any significance for the universe or only for the man?'; 'Is there anything like providence to guide us?' etc. For all these questions definite answers are yet to be found. Philosophy is interested not in the definite answers to these questions but simply in raising these sort of profound questions.

Philosophy increases our knowledge of what the things may be — it leads us to the world of possibilities. It keeps alive our sense of wonder by revealing familiar things in an unfamiliar aspect. As soon as we begin to philosophise we find that even the most familiar things of our everyday life, lead to problems quite unknown to us. Bertrand Russell in the first chapter of his famous book <a href="The Problems of Philosophy">The Problems of Philosophy</a> illustrated how our most familiar object like table, when philosophically analysed opens up innumerable possibilities finally leading to the profound question of appearence and reality.

Philosophic contemplation keeps our intellect free. It teaches us freedom and impartiality in the world of action and emotion. We can very well remember Tagore's reaction against the 'Swadeshi movement of abandoning foreign goods'. Even being a great sympathiser of swadeshi movement and connoisseur of the production of swadeshi

goods he had the free vision to recognise the danger involved in the movement --- the poor people of our country would be forced to buy swadeshi goods much more costly than the cheap foriegn goods available in the market in those times. Jean Paul Sartre's reaction against French colonialism in Algeria is another example of free thinking and impartial vision. In spite of being the supporter of communist idealogy, Sartre did not hesitate to raise his voice against the colonial policy of the communist government of France and for this protest he had to suffer a lot both inside and outside France.

Philosophy is an orientation of mind which we have to learn. The approach of philosophy is holistic. It teaches us to treat everything as part of a whole and tells us knowledge is nothing but the 'enlargement of the self'. It makes us 'citizens of the universe'. It urges us to start from the not-self, that is denial of self-interest, leading to the expansion of self. We have to forget our 'smaller I' and endeavour to enliven the 'greater I' within 'us'. And it is by this endeavour we can enbrace the humanity as a whole within the fold of our smaller being. It is this holistic spirit that urged Albert Einsteir to protest against carrying out the research on atomic explosion in the Manhattan Project in U.S.A. before the out-break of 2nd world war. The scientists engaged in that great research project were solely interested in the scientific advancement, but Einstein cautioned them. He apprehended that the findings of their valuable scientific research might be mishandled by the American Govt. as a weapon in their war against opposite power. We all know how his apprehension because tragically true. The whole world witnessed the great disaster in Herosima and Nagasaki caused by the explosion of atom bombs by U.S.A.

From the above analysis of the basic features of philosophy we can see that philosophy enlarges our intellectual imagination and inspires us to deal with the problems which are yet-to-be-known. It also expands our self by instilling in us the spirit of humanity. And it is exactly here lies the value of philosophy.

# PROSPERING THAILAND - INDIA ECONOMIC PARTNERSHIP

Tuhina Sarkar Dept. of Political Science

The resurgengce of Thailand-India economic relationship is one of the most significant events in the contemporary period between the two nations. It is a renaissance that is not only taking place with the transformation of Asia but also throwing open new opportunities to millions of people on both countries in this vast region to build a safer, more prosperous and freer world.

Thailand and India could collaborate more and become partners in several new initiatives despite an ongoing global financial crisis, the biggest ever probably in living memory, to help the unfolding of prospects and uncertainties in Asia and the world.

Today, both Thailand and India share common interests that extend far beyond day-to-day business. The best way to address this partnership is to take a long term view and a new shape of things to come. A long term in the sense that bilateral ties have long been intertwined in the context of history, culture, religion as well as language where Thailand has much inherited from India, directly or indirectly. The Royal Thai Embassy, New Delhi, in collaboration with the Indian Council for Cultural Relations (ICCR) and Thammasat University, organized the seminar on "Indo-Thai Historical and Cultural Link ages' under the theme of 'Reflections on Indo-Thai Historical and Contemporary Cultural Relations, at Thammasat University in Bangkok during 7-8 July 2008. The seminar aimed at fostering a better understanding of the long-standing Indo-Thai historical and cultural relations and enhancing people-to-people contact between the people of Thailand and India, which is an

integral component of Thailand's cultural diplomacy.

The seminar called for more-in-depth studies and further research on the subject. An awareness regarding the age-old Indo-Thai historical and cultural linkages was created which can play an important role in shaping modern societies and influence contemporary lifestyles both in Thailand and India.

As for a new shape of things to come, it is true that in these days, almost all countries, without any exception, including Thailand and India, are subject to forces of globalization, both positive and negative ones. Globalization without a proper regionalization is just an empty slogan. It is for this reason Thailand and India share major long term regional and bilateral policy challenges posed by their historical contact up to the present, especially the economic dimension set by market-driven trade, investment, technology spillovers and increasingly mobile human populations. Over the years, the friendship between the two nations has led to close collaboration in many areas.

#### **Fast Growing Economic Ties**

More recently the relationship has got even closer economically. It is here that major bilateral changes have occurred as both sides start to see and explore more economic opportunities offered by each other. India has rapidly changed to become Thailand's major trading partner and India ranks high being the most important South Asian investor in Thailand. Indian FDI approvals in Thailand had also substantially changed in the last few years, with the presence of not only existing Thai-Indian companies but also the new Indian multinationals like Aditya Birla, Tata and many others. Thai investors, the third among ASEAN (Association of South East Asian Nations) after Singapore and Malaysia, have also made more their presence with a

rising India and tremendous opportunities offered for their business inside the country. They are doing business in food processing, hotels and tourism, construction and electrical equipment manufacturing.

The openness gap with regard to trade in goods. services, capital and people flow between the two countries has consistently reduced and contributed substantially in improving their relationships in recent years, with Thailand. generally more open as an economy but India also fast growing and liberalizing its protective regimes. This could also be illustrated by the large number of Indian tourists who visited Thailand. In recent years, more than 600,000 Indian visitors came to visit the capital city of Bangkok and various parts of the country. At the same time, the number of citizens visiting India increases each year more than 50,000 tourists visited India spreading beyond the Buddhist pilgrimages of Bodh Gaya, Sanchi Sarnath, to other emerging and interesting cities. This illustrates the potential of people-to-people contact especially the young generation and great scope for collaboration on education and training. Indian software companies have started to invest in Thailand as a planned free trade zone in Khon Kaen (Khon Kaen has been designed as the Bangalore of Thailand) which would offer attractive incentives.

The investment incentives are more attractive in Khon Kaen compared to what IT Companies are seeing in countries such as Malaysia and Singapore.

Thailand's recent embrace with India rests largely on an increasing integration with the ASEAN + 6 countries (Australia, China, India, Japan, Korea and New Zealand). In consonance with the recent trade and investment trends Thailand has been able to reverse for the first time its trade deficit with India to a position of a trade surplus since 2005. In October 2003 India and Thailand signed a Framework

\*expeditiously negotiate for establishing an India-Thailand FTA\* including exchange of already outlined tariff concessions in as many as 84 items including goods, services and investment for a period of 10 years. India's economic policy changes since the beginning of 1990's in line with the liberalization process of the WTO also contributed to make Thailand-India economic ties an interesting new landscape to be followed more closely. One should also recognize the role played by multinationals from Japan, South Korea, the European Union, U.S.A., Taiwan Australia that are still active to build their regional production and service networks and use the potential of Thailand and India in securing their business outlook through FDI combining with trade.

## Links Moving to the Next Level

Seizing new arising opportunities of Thailand and India, however, will require strong leadership and commitment of both sides. It requires regionalism rather than isolationism and free trade rather than protectionism. When both think of their future they should expect more-not less-attention, trade, investment, innovation, people flows and other major areas of cooperation from different levels of their partnerships.

Diplomatic relations between India and Thailand was established in 1947, soon after India gained independence. India's 'Look East Policy' from 1993 and Thailand's 'Look West Policy' since 1996 set the stage for a substantive consolidation of bilateral relations. The past few years since 2001, have witnessed growing warmth, increasing economic and commercial links, exchange of high-level visits on both sides and the signing of a large number of Agreements leading to a further intensification of relations. Thailand and

India are cooperating in various multilateral flora like India's dialogue partnership with ASEAN, the ASEAN Regional Forum (ARF) and the East Asia Summit (EAS), the subregional grouping BIMSTEC involving Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand, Mayanmar, Nepal and Bhutan and trilateral transport linkages with Thailand, Myanmar and India.

Under the FTA agreement since late 2006 Thailand has been in surplus in regard to trade with India. In 2007 the surplus reached US \$ 596 million, a three-fold increase from 2006.

Among other things, there is a growing interest in connectivity linking the two regions. The two countries are well connected by air transport with more airlines, over hundred flights per week, to meet the demand.

Challenges for Future Partnership

Thailand and India's economic relations with Asia and the world will continue to be growing despite an uncertain economic environment worldwide. The crisis is and will continue to weaken the western economies, so the pendulum has swung, and to many, the economic prowess might move back to the Asian region. There is still much hope from a reasonable growth of China and India among the Asian nations in a post-crisis world. Thailand and India require close ties and commitment to working hard in solving all upcoming problems and finding new opportunities. The EAS, in which both countries are working together with others, will have to enhance the region's purposes and vitality.

Thailand relies on India's good spirit to join ASEAN constructively with the belief that India will join the East Asian region in development prosperity and peace for the benefits of people in Asia and the world in the years to come.

# নাগার্জুনের মূলমধ্যমককারিকা অবলম্বনে বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিতে কাল এর অন্তিত্ব

জয়িতা দত্ত দর্শন বিভাগ

ভারতীয় দর্শন চিন্তার প্রাথমিক ন্তরে ভারতীয় চিন্তাবিদদের কাছে কাল একটি অতি দুর্বোধ্য ধারণা ছিল। তাই একটি পর্যায়ে তাতা কালকে তথু জগতের একটি কারণ হিসাবে দেখতে তরু করল তাই নয়, তারা কালকে এমন একটি ব্যাপ্ত নীতিতে পরিণত করল যা তার নিজের মধ্য সমন্ত কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আলোচনা যত এগিয়েছে কাল কে দেখা হয়েছে এমন একটি কারণ হিসাবে যা অবিবিদাক আলোচনার পরিধি নিশ্চিত করে। একজন পরবর্তী জৈন দার্শনিক শিলাক্ত বলেন যে, প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কাল হল একটি কারণ, কারণ এটা দেখতে পাওয়া যায় যে কিছু কিছু ঘটনা যেমন গাছে ফুল ফোটা প্রমুখ কিছু নির্দিষ্ট সময়েই ঘটে, সবসময় নয়। উপনিবদে আবার নিভাতা ও অমরতার ধারণীর উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং পরিবর্তনশীলতা ও কারণতাকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং কারণতার ধারণাকে থুব কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে যেখানে নিভাতার ধারণাকে অস্বীকার করা হয়েছে সেখানে পরিবর্তনশীলতার ধারণা, কারণতা এবং কালের ধারণা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে।

বৌদ্ধ দর্শনের প্রথমদিকে কারণতার ধারণা ছিল মুখ্য আলোচ্য বিষয়।
বোধিবৃক্ষের তলায় সাধনারত অবস্থায় বৃদ্ধদেব তাঁর অর্ন্তদর্শনের মাধ্যমে উপলব্ধি
করেন যে অভিজ্ঞার জগতে আমরা যা কিছু পাই তা সবকিছুই কারণতার ধারণার
ভারা আবন্ধ। এইভাবে বৌদ্ধ দর্শনে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করা হয় যে সমন্ত কিছুই
অনিতা, শর্তসাপেক্ষ এবং কারণতার ভারা উৎপাদিত। কিন্তু এর ভারা একটা ধারণা
প্রস্কৃটিত হয় যে, কাল এর ধারণা সেইসব বন্তুর ধারণার সাথেই যুক্ত যা অনিতা
(temporal)।

বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন তার মূলমধ্যমককারিকার উনবিংশ পরিছেদে কাল এর ধারণা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ক্রিয়ার ভাব (tense) ছাড়া কাল (time) হয় না। নাগার্জুন-এর মতে বেহেতু tense real নয় তাই time real নয়। কারণ বর্তমানকে বুঝতে গেলে অতীতকে বুঝতে হবে, অতীতকে বুঝতে গেলে ভবিষাংকে বুঝতে হবে।

মূলমধামককারিকার উনবিংশ পরিচ্ছেদে-এ আলোচনা গুরু হয়েছে এভাবে...

যদি বর্তমান কাল এবং ভবিষাৎ কালের অন্তিক্তের পক্ষে অতীতকাল শর্ত হয়, তাহলে বর্তমান কাল এবং ভবিষাৎ কাল নিশ্চয়ই অতীতে থাকরে।

আবার বলা হয় যদি বর্তমান ও ভবিষ্যংকাল অতীতে থাকে না, তাহলে বর্তমান এবং ভবিষ্যং কিভাবে অন্তিভূশীল হবে ?

কর্মের ফলাফল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে time হল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমস্ত কর্মই সঙ্গে ফল উৎপন্ন করে না। বুদ্ধদেবের স্বীকৃতি অনুবায়ী মানুষের ব্যক্তিত্ব তার অগুনতি জীবনের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে, এর ফলে এই সমস্যাটা আরো বড়ো করে দেখা দিয়েছে। অভিধর্মপিটকে কর্মফলের ভিত্তিতে কর্মকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে —

- ক) কর্ম যা সঙ্গে সঙ্গে ফল উৎপল্ল করে।
- খ) কর্ম যা পরবর্তী জীবনে ফল উৎপন্ন করে।
- ৰ) কর্ম বা পরবর্তী জীবনের অনেকটা পরেই ফল উৎপন্ন করে।
- ঘ) কর্ম যা কোন ফল উৎপন্ন করে না।

কাল এর ধারণা অবশ্যস্তাবীভাবে কর্ম-এর ধারণার দ্বারা আবদ্ধ। কর্ম এর ধারণা থেকে কে অধিবিদাকে বিবেচনা নির্গত হয় তা time-এর ধারণার সাধে সংযুক্ত। বীজ থেকে যে অনুর উৎপন্ন হয় তা আবার ফল উৎপন্ন করে, এতে যে একটি পারস্পর্য থাকে, যদি বীজই না থাকে ভাহলে সেটি কীভাবে থাকবে ? কর্মের ধারণা সংক্রান্ত সৌঅন্ত্রিকদের অধিবিদ্যক পূর্বস্বীকৃতি এখানে পূণর্বিবেচনা (under review) করা হয়েছে। সৌত্রান্তিকরা জীবনধারার যে পরমাণুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল তা তাদের একটি ঘটনাকে ক্ষণধারার পারস্পর্য হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। যদিও একটি বীজ থেকে অনুর উৎপদ্দ হয় এবং অনুর থেকে ফল উৎপদ্দ হয় ইহার ময়ো একটি পারস্পর্য থাকে। কিন্তু ফল উৎপন্ন হওয়ার আগে বীজই তার আগে থাকরে এটি কখনই বাধাপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ ফল থেকে বীজ হবে এমন নয়। কাল কে একটি পৃথক সন্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে দিয়ে অধিবিদ্যাবাদীরা পূর্বস্বীকৃতি হিসাবে যদি ৰদেন যে, অতীত, বৰ্তমান ও ভবিবাং-এক মধ্যে একটি mutual relationship আছে অহলে যদিও ভারা পৃথক সন্তা ভাহলেও অতীতের মধ্যে বর্তমান এবং ভবিষাৎ কাল স্বাভাবিকভাবেই থাকে। অন্যভাবে বলতে গেলে অতীতকাল তার নিজের থেকে বর্তমান ও ভবিষাতকে উৎপদ্ম করে। এটি কার্যকারণ তন্তের একটি তাদাত্মাসূচক ব্যাখ্যা। কেউ যদি অতীতকে জানে তাহলে সে বর্তমান এবং ভবিষাৎ কি হবে তাও জানতে পারবে।

অতীতের মধ্যে শর্তহীনভাবে বর্তমান এবং ভবিষাৎ-এর উপস্থিতি প্রমানসিদ্ধ নয়। সূতরাং বর্তমান এবং ভবিষাৎকাল অপ্রত্যক্ষগ্রাহা। এইভাবে নাগার্জুন কাল (time) এর ধারণার সমালোচনা করেছেন।

নাগার্জুন তার বক্তবাটিকে উপস্থাপন করতে গিয়ে তাকে আশ্রয়বাকা ও সিদ্ধান্তের আকারে আকারিত করে বোঝাতে চান।

প্রধান আশ্রয় বাকা (Major Premis)

বর্তমান এবং ভবিষাৎ উভয়ই অতীতের অপেক্ষায় (contingent) থাকে। হেডুপদ (Middle term)

বর্তমান এবং ভবিষাতের মূল অস্তিত্ব নিহিত রয়েছে অতীতের গর্ডে, যা প্রমানসিদ্ধ নয়।

অতএব বর্তমান এবং ভবিষাৎ উভয়েরই অন্তিত্ব আছে এমন বলা যায় না। হেতৃপদটিকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে বিষয়টি এভাবে উপস্থাপিত

প্রথম আশ্রয়বাকা :

হয় -

বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অতীতের অপেক্ষায় থাকে না।

দ্বিতীয় আশ্রয়বাক্য :

এমনও বলা যায় না বে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ অতীতের অপেক্ষা করে না। অপ্রধান আশ্রয়বাক্য :

বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ একই সঙ্গে অতীতের অপেকা করে এবং করে না এমন হতে পারে না।

অতএব বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তাদের কোনো অন্তিত্ব নেই।

নাগার্জুন বলেন একই যুক্তি প্রয়োগ করা যায় বর্তমানের সাথে অতীত এবং ভবিষ্যতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং ভবিষ্যতের সাথে অতীত এবং বর্তমানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে। নাগার্জুন বলেন এই একই ধারণা উচ্চ, নিম্ন ও মধা এর মধাে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। এই সমন্ত,ক্ষেত্রে যে অধিবিদ্যক ধারণা নির্গত হয়, তা নির্গত হয় এই সম্পূর্ণ পৃথক সন্তা হিসাবে স্বীকার করার ফলে। এইরকম সম্পূর্ণ পার্থকা (absolute distinctions) প্রায়ই যৌক্তিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে করা হয়, যা অভিজ্ঞতাগত দিক থেকে প্রমানসিদ্ধ নয়। অভিজ্ঞতায় যেভাবে কালকে পাই তাকে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষাৎ এই তিনভাগে ভাগ করা যায় না।

বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন তার মূলমধামককারিকায় উনবিংশ পরিচ্ছেদে-এ

দেখাতে চেন্তা করেন কাল (time) এর নিজস্ব কোন অন্তিত্ব নেই, নাগার্জুনের মতে যদি time-এর নিজস্ব সন্তা থাকে, তাহলে time-এর ধারণার কোন অন্তিত্ব থাকরে না। যদি অতীতকাল, বর্তমান এবং ভবিষাৎকে উৎপন্ন করে তাহলে বর্তমান ও ভবিষাৎ কাল অতীতের মধ্যেই থাকরে। তাহলে এগুলির পৃথক সন্তা আছে এমনও বলা যাবে না এবং যদি বর্তমান এবং ভবিষাৎ অতীত থেকে আলাদা হয়, তাহলে সেগুলি অতীত-এর উপর নির্ভরশীল হবে না। কিন্তু বর্তমান এবং ভবিষাৎএর ধারণা অতীত এর সাথে একটি সম্পর্ককে নিঃসৃত করে যা আত্মবিরোধী। সূতরাং বর্তমান এবং ভবিষাৎ এর কোন অন্তিত্ব নেই। অতীতের সাথে বর্তমান এবং ভবিষাৎএর মিল বা অমিল কোনটাই বর্তমান এবং ভবিষাৎএর অন্তিত্ব স্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। একইভাবে কাল (time) এর যেকোন অংশের নির্ভরশীলতা তাদের অভিনত্ত এবং একটি অপরটিকে উৎপন্ন করে এই ধারণার দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় অতীতকাল স্বাধীন নয়, কারণ যদি একটি বর্তমান এবং ভবিষাৎএ পরিশত না হয় তবে তা অর্থহীন।

নাগার্জুন কাল (time) এর reality-র বিরুদ্ধে যে দ্বিতীয় আপন্তি তোলেন তা কাল এর সন্তাকে নির্দিষ্টভাবে বিদীর্শ করে না বরং এটি মূলত জ্ঞানজন্ত্রিক দিক থেকে ওঠে। চলমান সময়কে আঁকড়ে ধরা যায় না এবং স্থির সময় যাকে আঁকড়ে ধরা যায় তার কোন অন্তিত্ব নেই। তাহলে একজন কালকে কিভাবে প্রত্যক্ষ করে যদি তাকে আঁকড়ে ধরা নাই যায় ?

যদি কালকে পরিবর্তনশীল, ক্ষণছায়ী বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে বলতে হবে এমন কোন স্থির উপাদান এর মধ্যে নেই যা আমরা অভিজ্ঞাতার পাই। যদি আমরা আভিধার্মিক অধিবিদ্যাবাদীরা যেমন বলেন যে, কাল এর মধ্যে 'নিক্ল মুহুর্ত' আছে তা মেনে নিই, তবে কালকে বেশীদিন কাল বলে গণ্য করা যাবে না, কালকে কখনই সীমায়িত করা যায় না।

তৃতীয় যুক্তি যার দ্বারা বলা যায় কাল এর self-existence নেই তা হল, কাল নিজ্ঞে অন্য সন্তাবান বন্তুর উপর নির্ভরশীল নয়। এর কারণ হিসাবে বলা যায় নাগার্জুন বলেন যে জগং এ স্থাধীন বন্তু বলে কিছু থাকতে পারে না। যদিও কোন স্থাধীন বন্তু থেকে থাকে, তাহলেও জন্যানা বান্তব পদার্থের সাথে কালের যে সম্পর্ক থাকে তাতে কাল নিজ্ঞে স্থাধীন সন্তা হতে পারে না। যুক্তিটিকে আরো পরিদ্ধারভাবে বলতে গেলে কাল নিজ্ঞে একটি স্ব-সন্তাবান বন্তু নয় যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলিও স্থাধীন হবে। এটি অভান্ত গুরুত্বপূর্ণ যে যদিও নাগার্জুন কাল-এর স্বাধীন অন্তিত্বকে

অম্বীকার করেছেন কিন্তু বন্তুর পরিবর্তনশীলতাকে অম্বীকার করেননি। যেটা তিনি
অম্বীকার করতে চেয়েছেন তা হল কোন উপায়েই বাস্তবে কোন স্বাধীন (independent)
সন্তাকে অভিজ্ঞতায় ধরা যায় না। David, J. Kalupahana নাগার্জুনের বক্তব্যকে
সংক্ষিপ্ত করে বলেন, যে কাল (time) কে তিনি অম্বীকার করেন তা হল absolute
time। তিনি temporal phenomena কে অম্বীকার করেননি। নাগার্জুনের মতে
দৃটি স্বাধীন সন্তা অস্তিত্ব বা ভাব পদার্থ (existent) এবং কাল একে অপরের উপর
নির্ভরশীল হতে পারে না। যদি ভারা একে অপরের উপর নির্ভরশীল হয় ভাহলে
অস্তিত্বের সাপেক্ষে কাল এর স্বাধীন সন্তা থাকতে পারে না এবং অস্তিত্ব বা ভাব পদার্থ
হয়ে যাবে অনস্তিত্ব বা অ-ভাব পদার্থ। তাহলে সেখানে কিভাবে কাল থাকরে ?
নাগার্জুন কাল এবং phenomena (ইন্দ্রিরগ্রাহ্য বন্তু)র mutual dependence
কে অম্বীকার করেন যার ফলে ভারা আর স্বাধীন সন্তা হিসাবে perceived হয় না।

#### তথ্যপঞ্জী:-

- Mulamadhyamakakarika of Nagarjun Edited by David.
   J. Kalupahana
- 2. Indian theory of time Anindita Niyagi Balslev



Section III Science



# GIANT MAGNETORESISTANCE (GMR) AND ITS ROLE IN IT REVOLUTION

Dr. Gautam Kumar Mallik Department of Physics

#### 1. Introduction

Magnetism is a fascinating subject which is known since a few thousand years. This means that this phenomenon was already observed before recorded history began.

In the Near East region some ores were found to be "attractive" or "magnetic". In Europe, the use of this iron ore called Lodestone for navigation in a compass is unquestionably dated to about 1300. But, the first incontrovertible mention of a magnetic device used for establishing direction is to be found in a Chinese manuscript dated about 1040. The Lodestone was located into a spoon that was placed on a plate being of bronze. Rather than navigation this pointer was used for geomancy being a technique for aligning buildings in order to be in harmony with the forces of nature.

Today our understanding of magnetism is closely related to the concept of spin which arises from the relativistic description of an electron in an external electromagnetic field and becomes manifest in the Dirac equation. This concept results in the spin magnetic moment and the orbital magnetic moment which is due to the motion of electronic charges.

As throughout history magnetism is closely related to applications. A lot of common today's devices would be unthinkable without the forefront research areas in magnetism. One example is given by read heads in hard disks which allowed a tremendous enhancement of storage density. They are based on the discovery of the Giant Magnetoresistance (GMR).

The phenomenon of the "Giant Magnetoresistance" —was discovered in 1988 by two European scientists simultaneously but working independently: Professor Albert Fert of the University of Paris-Sud, France, and Professor Peter A. Grûnberg of the KFA research institute in Julich, Germany. They were awarded the 2007 Nobel Prize in Physics for their discovery of Giant Magnetoresistance. They saw very large resistance changes — 6 percent and 50 percent,

respectively — in materials composed of alternating very thin layers of various metallic elements. This discovery took the scientific community by surprise; physicists did not widely believe that such an effect was physically possible. These experiments were performed at low temperatures and in the presence of very high magnetic fields and used laboriously grown materials that cannot be mass-produced, but the magnitude of this discovery inspired scientists around the world on a mission to see how they might be able to explore the power of the Giant Magnetoresistance. They provided us with an invention whose importance cannot be doubted.

The "giant magnetoresistive" effect is one prerequisite for the modern IT revolution. Applications of this phenomenon have revolutionized techniques for retrieving data from hard disks. The discovery also plays a major role in various magnetic sensors as well as for the development of a new generation of electronics. The use of GMR can be regarded as one of the first major applications of nanotechnology.

The discovery of GMR immediately opened the door to a wealth of new scientific and technological possibilities, including a tremendous influence on the technique of data storage and magnetic sensors. Thousands of scientists all around the world are today working on magnetoelectronic phenomena and their exploration. The story of the GMR effect is a very good demonstration of how a totally unexpected scientific discovery can give rise to completely new technologies and commercial products.

Portable computers, music players, and powerful search engines, all require hard disks where the information is very densely packed. Information on a hard disk is stored in the form of differently magnetized areas. A certain direction of magnetization corresponds to the binary zero, and another direction corresponds to the binary value of one. In order to access the information, a read-out head scans the hard disk and registers the different fields of magnetization. When hard disks become smaller, each magnetic area must also shrink. This means that the magnetic field of each byte becomes weaker and harder to read. A more tightly packed hard disk thus requires a more sensitive read-out technique.

Towards the end of the 1990s a totally new technology became standard in the read-out heads of hard disks. This is of crucial

importance to the accelerating trend of hard disk miniaturization which we have seen in the last few years. Today's read-out technology is based on GMR observed in 1988. After their intense and dedicated research and development, GMR, makes its massmarket debut in IBM's record-breaking 16.8-gigabyte hard disk drive for desktop computers using a special GMR structure developed at IBM called a spin valve. A commercial product based on this design was first announced by IBM in December 1997. In the spin valve GMR head shown in the figure below, the copper spacer layer is about 2 nm thick and the Co GMR pinned layer is about 2.5 nm thick. The thickness of these layers must be controlled with atomic precision.



Commercial IBM giant magnetoresistance read head.

# 2. A Journey from Magnetoresistance to GMR

Originally, induction coils where used in read-out heads, exploiting the fact that a changing magnetic field induces a current through an electric coil. Even though this technology has not been able to keep pace with the demands of shrinking hard disks, induction coils are still in use for writing information onto the disk. For the readout function, however, magnetoresistance (MR) soon proved better suited.

It has long been known that the electric resistance of materials such as iron may be influenced by a magnetic field. In the middle of the nineteenth century, W. Thomson (1) (Lord Kelvin) measured the behaviour of the resistance of iron and nickel when it is placed in an external magnetic field. In 1857, The British physicist Lord Kelvin had already published an article showing that the resistance diminishes along the lines of magnetization when a magnetic field is applied to a magnetic conductor. If the magnetic field is applied across the conductor the resistance increases instead. The phenomenon called magnetoresistance (MR) is the change of resistance of a conductor in the presence of an external magnetic field. The electrical conductivity of spontaneously magnetized materials, for example, ferromagnets like iron, cobalt and nickel depends on the relative orientation of the electrical current and the magnetization. It was found that there was a difference in resistance between the parallel and perpendicular case. This phenomenon is called anisotropic magnetoresistance (AMR) (2) or spontaneous magneto-resistance anisotropy (SMA). However, intensive investigations on AMR started only in the 1950s with the work of Smit (3) and van Elst (4). Although technical applications of AMR were suggested in the 1970s, corresponding devices (sensors and read heads for hard disks) (Go"pel et al. 1989) (5) were not introduced commercially until about 20 years later. In general magnetoresistive effect is very small, at most of the order of a few percent.

The physical origin of AMR is the reduction of the symmetry of a magnetized material compared to its nonmagnetic state caused by the simultaneous presence of the magnetization and spin—orbit coupling. The first qualitative models to describe AMR were developed by Smit (3) and Campbell et al. (6) - (7) and have been extended subsequently by others. A phenomenological description of the AMR effect is obtained by assuming anisotropy in the transport properties, represented by a corresponding conductivity tensor. This anisotropy can primarily be ascribed to the presence of the spin—orbit coupling and the magnetic ordering. Starting from this, microscopic descriptions of the AMR effect have been developed. Most of this theoretical work has been based on Mott's two-current model (8) together with the use of some parameters. Modern ab

initio band structure calculations allow parameter-free calculations of AMR. Corresponding investigations essentially confirm the ideas of the previous more phenomenological work and supply a very detailed understanding for the physical mechanisms giving rise to AMR.

The AMR effect can be observed in principle in any spontaneously magnetized material. However, most experimental work has been devoted to systems based on the transition metals iron, cobalt, and nickel. In the search for materials with high AMR ratio  $\Delta \rho/\bar{\rho}$ , diluted and concentrated alloys among these elements, but also with other transition metals (e.g., chromium, vanadium, copper, palladium, and platinum) or non-transition elements (e.g., aluminum, silicon, tin) have been investigated (9) - (10) . Among these systems the highest values for the AMR ratio  $\Delta \rho/\bar{\rho}$  have been found for nickel-based alloys.

In particular, a rather simple empirical relationship between the AMR ratio  $\Delta\rho/\bar{\rho}$  and the average magnetic moment  $\mu$  has here for concentrated binary nickel-harmal limits by a suitable choice of the alloy partners and their concentration. An upper limit seems to be given by the data for NiCo alloys and NiFeCo alloys, which show AMR ratios of up to 30% at low temperatures. Unfortunately, the AMR ratio rapidly decreases with increasing temperature. For example, for Ni<sub>81</sub>Fe<sub>19</sub> (permalloy) one has AMR ratio  $\Delta\rho/\bar{\rho}=20\%$  at T = 20 K, but only about  $\Delta\rho/\bar{\rho}=3\%$  at T = 300 K.

$$^1$$
 AMR ratio  $\dfrac{\Delta \rho}{\bar{\rho}} = \dfrac{\rho_{\parallel} - \rho_{\perp}}{\bar{\rho}}$ , where  $\rho_{\parallel}$  and  $\rho_{\perp}$  are called longitudinal and transverse electrical resistivity, respectively, with their average  $\bar{\rho} = \dfrac{1}{3} \rho_{\parallel} + \dfrac{2}{3} \rho_{\perp}$ , giving the isotopic resistivity.

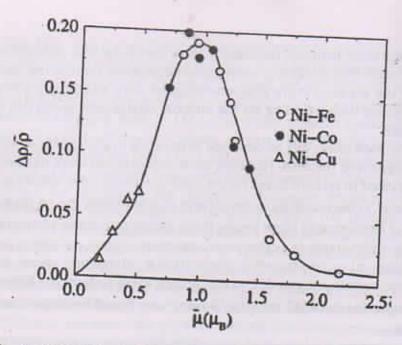


Fig. 1 : AMR ratio at 20K as a function of the average magnetic moment  $\tilde{\mu}$  for various 3d element alloys (after Wijn 1991) (11).

The AMR effect has been of technological importance, especially in connection with read-out heads for magnetic disks and as sensors of magnetic fields. The most useful material has been an alloy between iron and nickel, Ni<sub>81</sub>Fe<sub>19</sub> (permalloy) because it has high AMR ratio, free of magnetostriction and a very low coercivity field. In general, however, there was hardly any improvement of the performance of magnetoresistive materials since the work of Lord Kelvin. The general consensus in the 1980s was that it was not possible to significantly improve on the performance of magnetic sensors based on magnetoresistance. This AMR was the direct predecessor to giant magnetoresistance (GMR) as a standard technology in read-out heads. GMR took over at a point when an even more sensitive technology had become necessary.

GMR materials are so called magnetic multilayers, where layers of ferromagnetic and non-magnetic metals are stacked on each other. The widths of the individual layers are of nanometre size – i.e. only a few atomic layers thick. A nanometer is a mere billionth of a meter and nanotechnology is concerned with layers consisting of only a

few individual strata of atoms. Deep down at atomic level, matter behaves differently and therefore nanometer-sized structures will often exhibit totally new material properties. This is true not only for magnetism and electric conductivity, but also for properties like strength or the chemical and optical qualities of a material. In this sense, the GMR-technology may also be regarded as one of the first major applications of the nanotechnology that is now so popular in a very diverse range of fields.

In the original experiments leading to the discovery of GMR one group, led by Peter Grünberg (12), used a trilayer system Fe/Cr/Fe, while the other group, led by Albert Fert (13), used multilayers of the form (Fe/Cr)n where n could be as high as 60.

In the figures below the measurements of Grünberg's group are displayed (Fig. 2a) together with those of Fert's group (Fig. 2b). The y-axis and x-axis represent the resistance change and external magnetic field, respectively. The experiments show a most significant negative magnetoresistance for the trilayer as well as the multilayers. The systems to Fig. 2b, involving large stacks of layers, show a decrease of resistance by almost 50% when subjected to a magnetic field. The effect is much smaller for the system to Fig. 2a, not only because the system is merely a trilayer but also because the experiments led by Grünberg were made at room temperature, while the experiments reported by Fert and co-workers were performed at very low temperature (4.2K).

Grünberg (12) also reported low temperature magnetoresistance measurements for a system with three iron layers separated by two chromium layers and found a resistance decrease of 10%.

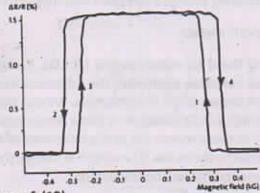


Fig. 2a: After ref. (12).

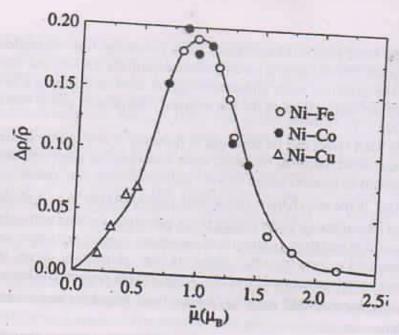


Fig. 1 : AMR ratio at 20K as a function of the average magnetic moment  $\bar{\mu}$  for various 3d element alloys (after Wijn 1991) (11).

The AMR effect has been of technological importance, especially in connection with read-out heads for magnetic disks and as sensors of magnetic fields. The most useful material has been an alloy between iron and nickel, Ni<sub>81</sub>Fe<sub>19</sub> (permalloy) because it has high AMR ratio, free of magnetostriction and a very low coercivity field. In general, however, there was hardly any improvement of the performance of magnetoresistive materials since the work of Lord Kelvin. The general consensus in the 1980s was that it was not possible to significantly improve on the performance of magnetic sensors based on magnetoresistance. This AMR was the direct predecessor to giant magnetoresistance (GMR) as a standard technology in read-out heads. GMR took over at a point when an even more sensitive technology had become necessary.

GMR materials are so called magnetic multilayers, where layers of ferromagnetic and non-magnetic metals are stacked on each other. The widths of the individual layers are of nanometre size – i.e. only a few atomic layers thick. A nanometer is a mere billionth of a meter and nanotechnology is concerned with layers consisting of only a

few individual strata of atoms. Deep down at atomic level, matter behaves differently and therefore nanometer-sized structures will often exhibit totally new material properties. This is true not only for magnetism and electric conductivity, but also for properties like strength or the chemical and optical qualities of a material. In this sense, the GMR-technology may also be regarded as one of the first major applications of the nanotechnology that is now so popular in a very diverse range of fields.

In the original experiments leading to the discovery of GMR one group, led by Peter Grünberg (12), used a trilayer system Fe/Cr/Fe, while the other group, led by Albert Fert (13), used multilayers of the form (Fe/Cr)n where n could be as high as 60.

In the figures below the measurements of Grünberg's group are displayed (Fig. 2a) together with those of Fert's group (Fig. 2b). The y-axis and x-axis represent the resistance change and external magnetic field, respectively. The experiments show a most significant negative magnetoresistance for the trilayer as well as the multilayers. The systems to Fig. 2b, involving large stacks of layers, show a decrease of resistance by almost 50% when subjected to a magnetic field. The effect is much smaller for the system to Fig. 2a, not only because the system is merely a trilayer but also because the experiments led by Grünberg were made at room temperature, while the experiments reported by Fert and co-workers were performed at very low temperature (4.2K).

Grünberg (12) also reported low temperature magnetoresistance measurements for a system with three iron layers separated by two chromium layers and found a resistance decrease of 10%.

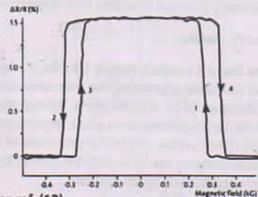


Fig. 2a: After ref. (12).

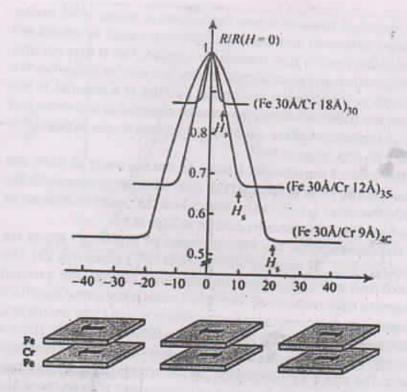


Fig. 2b : After ref. (13).

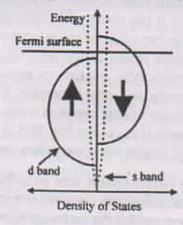
The title of the original paper from Fert's group already referred to the observed effect as "Giant Magnetoresistance". Grünberg also realized at once the new possibilities for technical applications. From this very moment the area of thin film magnetism research completely changed direction into magnetoelectronics.

### A. Ferromagnetic metals

Among the d transition metals (Sc...Cu, Y...Ag, Lu...Au, i.e. 3d, 4d, and 5d transition elements), the 3d metals iron, cobalt and nickel are well-known to be ferromagnets. Among the lanthanides (the 4f elements, La-Lu) gadolinium is also a ferromagnet. The origin of magnetism in these metals lies in the behaviour of the 3d and 4f electrons, respectively. In the following it is mainly the magnetism in the 3d elements that will be discussed.

In the free atoms, the 3d and 4s atomic energy levels of the 3d transition elements are hosts for the valence electrons. In the metallic state these 3d and 4s levels are broadened into energy bands. Since the 4s orbitals are rather extended in space there will be a considerable overlap between 4s orbitals belonging to neighbouring atoms, and therefore the corresponding 4s band is spread out over a wide energy range (15-20 eV). In contrast to this, the 3d orbitals are much less extended in space. Therefore the energy width of the associated 3d energy band is comparatively narrow (4-7 eV). In practice one cannot make a clear distinction between the 3d and 4s orbitals since they will hybridize strongly with each other in the solid. Nevertheless for simplicity this two band picture will be used here and the 3d electrons will be considered as metallic - i.e. they are itinerant electrons and can carry current through the system, although they are still much less mobile than the 4s electrons.

A useful concept in the theory of solids is the electron density of states (DOS), n(E), which represents the number of electrons in the system having energy within the interval (E, E+dE). According to the exclusion principle for fermions (in this case electrons), only one electron can occupy a particular state. However each state is degenerate with respect to spin and can therefore host both an electron with spin up and an electron with spin down. In the ground state all the lowest energy levels are filled by electrons and the highest occupied energy level is called the Fermi energy, E, For a non-magnetic 3d metal, sometimes referred to as a paramagnet,



there are equally many electrons with spin up as with spin down, i.e. there is no net magnetization. The so called spin polarization, P, [P = (N'! - N''!)/(N'! + N''!), where N'! (N''!) = number of electrons with spin up (down)], is here equal to zero.

Fig. 3: Schematic electronic band structure for a strong ferromagnet, e.g., cobalt.

In Fig.3 the density of states is illustrated schematically for a ferromagnet, where N'! is larger than N"!, so that there is a net spin polarization, P > 0. In order to compare the energy for the ferromagnetic state with the energy for the paramagnetic state one can start from the paramagnetic state and allow for a small imbalance in the number of spin up and spin down electrons. A transfer of spin down electrons from the spin down band into the spin up band leads to more exchange energy in the system, which means a lowering of the total energy (a gain). On the other hand such a process requires a transfer of electrons from spin down levels below the initial Fermi energy, into spin up levels situated just above the Initial Fermi energy. This will necessarily lead to a loss of band energy, "kinetic energy" and thus to an increase of the total energy (a loss). Thus there is a competition between two opposite effects. This can be formulated as the so called Stoner criterion (14) - (15) for magnetism, namely that when  $I N(E_z) > 1$ ,

the system will be a ferromagnet. Here I is called the Stoner exchange parameter and  $N(E_{\rm p})$  is the density of states at the Fermi energy. The Stoner parameter has a specific value for the individual element, while  $N(E_{\rm p})$  depends much more on the particular spatial arrangements of the atoms relative to each other (like crystal structure). Furthermore, and most important,  $N(E_{\rm p})$  tends to be high for systems with narrow energy bands as is the case for the heavier 3d transition elements (Fe, Co and Ni). This is the explanation for the ferromagnetism among the d transition metals.

The situation for a ferromagnetic spin polarization is illustrated in Fig. 3. The vertical displacement between the spin up and spin down densities of states exemplifies the exchange energy splitting between

the spin up and spin down energy bands, which is relevant for the metals Fe, Co and Ni. In particular the density of states at the Fermi energy  $N(E_{\rm p})$  can now be very different for the two spin bands. This also means that for a ferromagnet the character of the state at the Fermi energy is quite different for spin up and spin down electrons. This is an important observation in connection with the GMR effect. This picture of 3d energy bands (Fig. 3) for the ferromagnetic metals is often referred to as the itinerant model (16), also known as the Stoner-Wohlfarth model (14) - (15).

One important property of ferromagnets is that at high temperature their magnetism is lost. This happens at a well defined temperature, the so called Curie temperature, T<sub>c</sub>. For the present systems (Fe, Co and Ni) these critical temperatures are far above room temperature and can be neglected.

## B. Resistance and magnetization

In a metal conductor, electricity is transported in the form of electrons which can move freely through the material. The current is conducted because of the movement of electrons in a specific direction, the straighter the path of the electrons, the greater the conductance of the material. Electric resistance is due to electrons diverging from their straight path when they scatter on irregularities or defects and impurities in the material. The more the electrons scatter, the higher the resistance.

An electrical current of electrons sent through a metallic system will always experience a resistance R. (Exceptions are the so called superconductors where below a certain temperature the current can flow without resistance). There are a number of reasons for this. In a crystal the atoms will always vibrate (phonons) around their equilibrium positions, thereby deviating from the perfect lattice positions and the conduction electrons may be scattered by these deviations (electron – phonon interaction). Other important contributions to the resistance of a metal are scattering of electrons against impurities and irregularities or defects. The only electrons that participate in the electrical conduction process are those at (or very close to) the Fermi level. For paramagnetic metals there is no

difference between the spin up and spin down electrons and they contribute equally to the resistance.

Already in 1936 Sir Nevil Mott (17) considered the electrical conductivity of d transition elements. He suggested that the conductivity was mainly determined by the 4s electrons which are easily mobile due to the wide energy range of the bands derived from the 4s-states. However in a scattering process the s electrons can scatter into the many d states which are available at the Fermi level. Therefore they experience a strong scattering giving rise to a considerable resistance. On the other hand for Cu, the element following Ni in the Periodic Table, all the 3d states are situated below the Fermi level and therefore not available for scattering processes. This explains the particularly high conductivity of Cu.

In the 1960s and 1970s Fert together with Campbell studied in great detail the conductivity of 3d ferromagnetic materials (12), (18). They carried out extensive investigations of resistivity changes which occur when low concentrations of alloying elements, like Cr and other transition metals, are put as scattering centres into, for example, Fe and Ni. From these studies they could confirm that in a ferromagnet like iron there are two types of carriers, one made up from spin up electrons and one from spin down electrons. Since the density of states at the Fermi surface is quite different for the two spin states it follows that there is a significant difference in resistance for the spin up electrons and the spin down electrons. There could also be contributions to the resistance from scattering processes where the spins are flipped. This could for example be due to scattering against spin waves or from the spin orbit coupling. However these effects are small and will be neglected here. Thus the picture which is emerging is that the electrical current in a ferromagnet like iron, cobalt and nickel consists of spin up and spin down carriers, which experience rather different resistances.

In a magnetic material the scattering of electrons is influenced by the direction of magnetization. The very strong connection between magnetization and resistance that one finds in GMR arises because of the intrinsic spin of the electron that induces a magnetic moment. Spin is directed in either one of two opposite directions. In a magnetic material, most of the spins point in the same direction (in parallel). A smaller number of spins, however, always point in the opposite direction, anti-parallel to the general magnetization. This imbalance gives rise not only to the magnetization as such, but also to the fact that electrons with different spin are scattered to a smaller or greater degree against irregularities or defects and impurities, and especially in the interfaces between materials. Material properties will determine which type of electron is scattered the most.

#### C. Growth of superlattices

From the beginning of the 1970s the development in physics, chemistry and materials science had led to new experimental techniques allowing scientists to manufacture completely novel materials. Using what was called epitaxial growth one could start to produce artificial materials building one atomic layer after the next. Techniques that were introduced at this time involved, for example - sputtering, laser ablation, molecular beam epitaxy and chemical vapour deposition. Molecular beam epitaxy was already being used in the late 1960s to make thin semiconducting materials and at the end of the 1970s nanometre thick metallic layers could be produced. This was first applied to non-magnetic metals, but later also to metallic ferromagnets. At the same time, a number of characterization techniques had been largely improved, utilizing for example the magneto-optic Kerr effect (MOKE) and light scattering from spin waves. Using these methods it was possible to grow metallic multilayers involving for example iron and study their magnetic properties.

In order to produce well-defined materials the choice of substrate on which to grow the material is of great importance. Commonly used materials are silicon, silicon dioxide, magnesium oxide and aluminum oxide. To obtain well-behaved metallic multilayers it is important that the lattice parameters for the different metallic layers match each other and it is also an advantage if the two metals forming the multilayer have the same crystal structure. This is the case for chromium and iron, where both metals adapt the bcc (body-centred cubic) crystal structure and where in addition

they have very similar lattice spacing. This was important for the studies for which this Nobel Prize is awarded undertaken by the groups of Fert and Grünberg. In addition it was also extremely important that it was now possible to grow multilayers where the spatial separation between the magnetic layers is of the order of nanometres. In order to exhibit the GMR effect the mean free path length for the conduction electrons has to greatly exceed the interlayer separations so that the electrons can travel through magnetic layers and pick up the GMR effect. Without the new experimental growth techniques this requirement could not have been fulfilled and the GMR effect would have remained unknown. In this connection it should be mentioned that, in several publications prior to the work of Fert and Grünberg, there were reports of observations of substantial (of the order of a few per cent) magnetoresistance (MR) effects. In none of them were the observations recognized as a new effect.

# D. Role of non-magnetic layer(s)

It has been known for a long time that disturbances like defects and impurities in metallic systems become screened by the surrounding conduction electrons. The disturbance gives rise to decaying oscillations of the electron density as a function of the distance from the disruption (so called Friedel oscillations). Similarly, a magnetic impurity atom in a metallic surrounding gives rise to an induced spin polarization of the electron density. With increasing distance from the magnetic impurity there will be an oscillation in the sign of the polarization and the disturbance will also decay in magnitude with distance. As a consequence, the magnetic moment of a second impurity placed relatively close to the first one, will become aligned parallel or antiparallel to the magnetic moment of the first moment depending on the sign of the induced polarization at that particular distance. This coupling (exchange coupling) between magnetic moments was well-known for the rare earth metals where each atom possesses a magnetic moment originating from the very tightly bound (and localized) 4f electronic configuration positioned deep inside the atom. In fact the magnetism of the heavier lanthanide metals originate from this interaction.

As already mentioned, gadolinium is a ferromagnet where the magnetic moments originate from the localized 4f electrons on each atom having a 4f' configuration. That is, all the 4f magnetic moments point in the same direction and surrounding these moments there are three conduction electrons per atom which mediate the interaction between the 4f magnetic moments. In 1986 Majkrzak et al. (19) published work on a super-lattice of Gd/Y/Gd where they reported an antiparallel magnetic moment alignment between the Gd layers for the case of 10 monolayers of Y. This could be understood from the way that a ferromagnetic Gd layer induces an oscillatory spin polarization of the normally non-magnetic Y metal and that the second Gd layer happens to be at a distance where an antiferromagnetic alignment is preferred. Practically simultaneously Grünberg et al. (20) discovered an anti-ferromagnetic coupling between the iron layers for the Fe/Cr/Fe trilayer. This can be explained in a similar way to the Gd/Y/Gd case. It should be remarked, however, that in both cases, due to the geometry, there are important contributions to the interlayer exchange coupling from quantum interference of the electron waves reflected at the magnetic layers (21). In the present context it is however sufficient to conclude that the important role of the electrons of the nonmagnetic layer(s) is that they provide the coupling mechanism between the magnetic layers.

The next step was to investigate the dependence of the coupling on the thickness of the intermediate non-magnetic layers. Several groups identified a change of sign with increasing thickness (22), (23). A thorough study of the dependence of the oscillatory behaviour on the thickness of the non-magnetic layer, its dependence on the material of the non-magnetic layer as well as on the dependence of the material of the magnetic layer itself was made by Parkin (24). Here he actually utilized the GMR effect as a tool to study this dependence. In the preparation of the multilayers Parkin used a magnetron sputter deposition technique. With this method it was possible to prepare a large number of samples under comparable conditions. This extensive work was important for the further development of the GMR effect into a working device (25), (26), (27).

#### E. Phenomenological idea of GMR

The resistance of a GMR device can be understood from the magnetic configuration for the FM/NM/FM (ferromagnetic/nonmagnetic/ferromagnetic) multilayer is made together with the corresponding electron density of state for the two ferromagnetic sides (FM). In the absence of a magnetic field the two FM layers are separated from each other in such a way that they have opposite magnetization directions. In the presence of a magnetic field the magnetizations of the two FM layers will be parallel . An electrical current is now sent through the system for both configurations. As already mentioned above the current through the FM layer is composed of two types - one spin up current and one spin down current - and the resistance for these two currents will differ. When an electron leaves the first iron layer and enters the non-magnetic metal there will be additional scattering processes giving rise to extra resistance. Since the spin up and spin down particles have different density of states at the Fermi level (or rather, they originate from energy levels having different character), the resistance not only within the FM layers, but also that originating from the FM/NM interface will be different for the two spins. Inside the NM layer the up and down spins will experience the same resistance, but generally this is low compared to those in the FM layers and FM/NM interfaces and can here be neglected.

When the electrons enter the second iron layer they will again experience spin dependent scattering at the NM/FM Interface. Finally the spin up and spin down electrons go through the second iron layer with the same resistance as in the first iron layer, which still of course differs for the two spins. For simplicity the resistance for the spin up (down) electrons through the FM layer and the scattering at the interface to the NM layer will be called R'! (R"!). Thus when the two layers have parallel spin polarizations (magnetizations), i.e. in the presence of an external magnetic field (H), the resistance for the spin up channel is 2 R'l and for the spin down channel it is 2 R"!. Standard addition of resistances for a parallel current configuration gives the following total resistance, R,, in the presence of an external magnetic field; R, = 2R'!R"!/(R'! + R"!).

In the case of no external magnetic field, (H=0), the configuration between the two magnetic layers is antiparallel. In the case the first scatterings in the left part of the multilayer system exactly the same as before. However, when a spin up electron enters into the second FM layer it finds itself in a totally upside-sown situation where the conditions are now exactly the same as they were for the spin down electron in the initial FM layer. Thus the spin up particle will now experience a total resistance of R'! + a'l. The spin down particle will be affected in the same (but opposite) way and its resistance will be R"! + R'!. The total resistance will accordingly be R<sub>0</sub> = (1/2)(R'!+R"!). Thus the difference in resistance between the two cases (magnetic field or not) becomes:

$$AR = R_H - R_0 = -(1/2)(R'I - R''I)2/(R'I + R''I).$$

Thus the larger the difference between R'I and R"I the larger the negative magnetoresistance. This expression clearly shows that the magnetoresistance effect arises from the difference between the resistance behaviour of the spin up and down electrons.

#### F. Concluding remarks

The discovery by Albert Fert and Peter Grünberg of giant magnetoresistance (GMR) was very rapidly recognized by the scientific community. GMR is a good example of how an unexpected fundamental scientific discovery can quickly give rise to new technologies and commercial products. The discovery of GMR opened the door to a new field of science, magnetoelectronics (or spintronics), in which two fundamental properties of the electron, namely its charge and its spin, are exploited simultaneously. Emerging nanotechnology was an original prerequisite for the discovery of GMR, now magnetoelectronics is in its turn a driving force for new applications of nanotechnology.

### Bibliography

Thomson, W., "On the Electro-Dynamic Qualities of Metals: Effect
of Magnetization on the Electric Conductivity of Nickel and of Iron".

Proceedings of the Royal Society of London, 8, 546-550 (1856-1857).

- Fert, I.A. and Campbell, A., "Transport Properties of Ferromagnets" in Ferromagnetic Materials, ed. E.P. Wohlfarth, North-Holland, Amsterdam, Vol. 3, p. 747 (1982).
- 3. Smit, J., Physica 16, 612-27 (1951).
- 4. Elst, H.C. van., Physica 25, 708-20 (1959).
- Go"pel, W. and Hesse, J., "Magnetic Sensors", ed. J.N. Zemel, VCH, Weinheim, Germany, (1989).
- Campbell, I.A., Phys. Rev. Lett., 24, 269–71 (1970).
- 7. Campbell, I.A., Fert, A. and Jaoul, O., Physica C3, S95-101 (1970).
- 8. Akai, H., Physica, B86-88, 539-40 (1977).
- Potter, T.R. and McGuire, R.I., IEEE Trans. Magn. 11, 1018–38 (1975).
- 10. Dorleljn, J.W.F., Philips Res. Rep. 31, 287-410 (1976).
- "Magnetic Properties of Metals d-Elements, Alloys and Compounds", ed. H.P.J. Wijn, Springer-Verlag, Berlin (1991).
- 12. Binasch, G., Grünberg, P., Saurenbach, F., and Zinn, W., "Enhanced magnetoresistance in layered magnetic structures with antiferromagnetic interlayer exchange", Phys. Rev. B39, 4828 (1989).
- 13. Baibich, M.N., Broto, J.M., Fert, A., Nguyen van Dau, F., Petroff, F., Eitenne, P., Creuzet, G., Friederich, A., and Chazelas, J., "Giant

Magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr Magnetic Superlattices", Phys. Rev. Lett., 61, 2472 (1988).

- 14. Kübler, J., "Theory of itinerant electron magnetism", Clarendon Press, Oxford (2000).
- Mohn, P., "Magnetism in the Solid State", Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (2003).
- 16. Herring, C., "Magnetism; a treatise on modern theory and materials", Vol. 4, series eds. G.T. Rado, and H. Suhl, Academic Press, New York (1966).
- 17. Mott, N.F., "The Electrical Conductivity of Transition Metals", Proc. Roy. Soc. A153, 699 (1936).
- Fert, A., and Campbell, I.A., "Two-current conduction in nickel", Phys. Rev. Lett. 21, 1190 (1968).
- 19. Majkrzak, C.F., Cable, J.W., Kwo,J., Hong, M., McWhan, D.B., Yafet, Y., Waszczak, J.V. and Vettier, C., "Observation of a Magnetic Antiphase Domain Structure with Long-Range Order in a Synthetic Gd-Y Superlattice", Phys. Rev. Lett. 56, 2700 (1986).
- Grünberg, P., Schreiber, R., Pang, Y., Brodsky, M.B., and Sowers,
   H., "Layered Magnetic Structures: Evidence for Antiferromagnetic Coupling of Fe Layers across Cr Interlayers", Phys. Rev. Lett. 57, 2442 (1986).
- 21. Ortega, J.E., Himpsel, F.J., Mankey, G.J., and Willis, R.F., "Quantum-Well States and Magnetic Coupling between

Ferromagnets through a Noble-Metal Layer", Phys. Rev. B 47, 1540 (1993).

- 22. Heinrich, A., Celinski, Z., Cochran, J.F., Muir, W.B., Rudd, J., Zhong, Q. M., Arrott, A.S., Myrtle, K., and Kirschner, J., "Ferromagnetic and Antiferromagnetic Exchange Coupling in bcc EpitaxialUltrathin Fe(001)/Cu(001)/Fe(001) Trilayers", Phys. Rev. Lett. 64, 673 (1990).
- 23. Parkin, S.S.P., More, N. and Roche, K.P., "Oscillations in Exchange Coupling and Magnetoresistance in Metallic Superlattice Structures—Co/Ru, Co/Crand Fe/Cr", Phys. Rev. Lett. 64, 2304 (1990).
- 24. Parkin, S.S.P., "Systematic Variation of the Strength and Oscillation Period of Indirect Magnetic Exchange Coupling through the 3d, 4d, and 5d Transition Metals", Phys. Rev. Lett. 67, 3598 (1991).
- 25. Dieny, B., Speriosu, V.S., Parkin, S.S.P., and Gurney, B.A., "Giant Magnetoresistance in Soft Ferromagnetic Multilayers", Phys. Rev. B 43, 1297 (1991).
- Chaiken, A., Gutlerrez, C.J., Krebs, J.J., and Prinz, G.A.,
   "Composition Dependence of Giant Magnetoresistance in Fe/Ag/ CoxFe1-x Sandwiches", J. Magn. Magn. Mat. 125, 228 (1993).
- Heim, D.E., Fontana, R.E., Tsang, C., and Speriosu, V.S., "Design and Operation of Spin-Valve Sensors", IEEE Trans. on Magn. 30, 316 (1994).

## SPECIES WITHOUT BORDER

Dr. Siddhartha Sankar Bhattacharya Dept. of Zoology.

Presently two groups of scientists seem to be making headway towards one of evolutionary biology's most difficult problems that is how the formation of new species or 'speciation', actually happens, even 150 years after the publication of Charles Darwin's Origin of Specie Understanding speciation is still a fundamental problem in biology. It is believed that speciation usually occurs when pre-existing populations are divided by a geographical barrier, such as a river or a range of mountains. Thereafter unable to interbreed, the surrounded populations go their own way, until, eventually, two new species are found where there was one before. The central part of the argument is the barrier: without one, individuals have the potential to breed freely, mixing up parental traits and keeping the population homogeneous. Theorists have not been able to show convincingly how speciation might occur without physical separation of the founding populations, except in certain rather specialized circumstances.

This difficulty, though, is hard to believe with mounting evidence that many species form without physical barriers to interbreeding, so-called 'sympatric' speciation. Many lakes in Africa, for example host 'flocks' of dozens or hundreds of closely related species of cichild fish, all of which seem to have evolved in the same body of water from a single, ancestral species often within a few thousand years — an evolutionary eye blink. Although similar in general anatomy, these fishes display a dazzling array of colors, habits and ecological specializations: some gaze algae, whereas others eat other fishes. One species lives by plucking the eyes from other cichlids.

### How population will become divided:

Sympatric speciation ought to be simple. If a lake, newly colonized by a species of fish, contains two distinct prey items — large beetles and small shrimp, say — then natural selection should favor the evolution of large and small fishes, leaving medium-sized fishes at a disadvantage. Eventually, the population will become divided into large and small fishes, each of which will mate with their own kind.

### The major problem is sex:

Sexual reproduction scrambles the genes in each generation, so that there will always be a proportion of medium-sized fishes in the population. This tendency can only be kept at bay by rigorously finicky fishes, which will only mate with fishes of their own general appearance. Even then, there is a problem: that is, if the genes that govern mate choice (for attractive coloration, for example) are different from the genes that govern ecological specialization (such as size and shape), there is still the possibility that fishes specialized for one kind of life will prefer to mate with fishes specialized for another.

It is at this point that theorists have puzzled, by assuming that genes for mate choice and ecological specialization are either the same, or can effectively be treated as such. But this assumption need not apply to real life.

### Where next?

This is where the new research comes in. Ecological specialization is the key to driving sympatric speciation. One study is from Alexey S. Kondrashov of the National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, and Fyodor A. Kondrashov of Simon's Rock College, Great Barrington, Massachusetts; the other from Ulf Dieckmann and Michael Doebeli of the Institute of Systems Analysis, Laxenberg, Austria, and the University of Basel, Switzerland, have giving some bracing model on sympatric speciation.

## Model on sympatric speciation :

Both Sets of researchers model have apparently realistic scenarios, involving several genes for mate choice and ecological specialization. Although their results and methods differ in their technical details, both show how sympatric can be achieved by a steady build-up of genetic associations between genes for mate choice and genes for specialization, until a point comes when the two sub-populations become sexually isolated — the point where speciation can be said to have happened.

The Dieckmann and Doebeli model, in particular, provides a good account for what seems to have happened in some African crater lakes, which become colonized by fishes which then diversify into a range of different forms, despite the small size of each lake. Dieckmann and Doebeli envision a situation in which individuals of a single species compete for a single, abundant kind of food item. In such situations, competition can become so intense that some individuals diversify their tastes, switching to other food items which, although less abundant, are less popular, and so the individuals experience less competition. If choosy mating follows a taste for new food items, speciation soon follows. So speciation process works best in new, empty habitats.

Reference: Nature, July issue, 1999.

# MECHANISM OF OXOALLOPURINOL -A URIC ACID LOWEING DRUG.

Dr. Bireswar Mukherjee Department of Chemistry

বর্তমান সময়ে বহু লোক উচ্চ ইউরিক আসিডজনিত রোগে ভূগছেন।
সাধারণ মানুষের রক্তে ইউরিক আসিড মান Y-5 mg/L। প্রধানত প্রোটনজাতীয়
থাবার পরিপাকের সময় Uric Acid উৎপদ্দ হয়। যৌগটি মুদ্রের মাধ্যমে শরীরের
বাইরে চলে যায়। Xanthine Oxidase এনজাইম আমানের শরীরে Xanthine
কে জারিত করে (Oxidation) Uric Acid উৎপদ্দ করে। নিচে সংক্ষেপে বিক্রিয়াটি
(Net reaction বলা হলোঃ-

Xanthine Oxidase এর Structure জানা খুবই জরুরী কেননা শরীরে Xanthine এর মাত্রা (Concentration) বাড়তে থাকলে Uric Acid মাত্রাও শরীরে বাড়ে। Uric Acid এর কেলাস (Crystal) হাড়ের সন্ধিছলের রসে জমা হতে থাকে। জ্বনে ক্রনে আনে Uric Acid এর কেলাসের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে চলাচল করার সময় সন্ধিছলে হাড়ের সাথে কেলাসগুলির ঘর্ষণ (Friction) হয়। তার জন্য চলাচল করতে অসুবিধা হয়। একে আমরা বলি গেটে বাত। Uric Acid এর গাড়ত্ব কমানোর সব থেকে সহজ উপায় হলো প্রোটিন জাতীয় থাবার কম বা না খাওয়া। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগটি বংশগত। তা সজেও যদি Concentration না কমে অহলেই ঔষধের দরকার। বর্তমানে বছল প্রচলিত Oxo-anopurinol যৌগটি ব্যবহার করা হয়। Oxo-anopurinol এর যৌগটির আকৃতি Xanthine-এর খুবই সদৃশা ঃ-

এবার Oxo allopurinol এর কাজ হলো Xanthine Oxidase (Enzyme) এর কার্যক্ষমতা (activity) কমিয়ে দেয়। Xanthine Oxidaseএর আকৃতি (Structure) অত্যন্ত জটিল। সহজভাবে বলতে গেলে এর মধ্যে দুইটি Mo (Molybdenum) পরমানু (atom), চারটি Fe S আংশ (residue) এবং দুইটি FAD (Flavin) Adenine Dinucelotide) অংশ থাকে। এই উৎসেচকটির (Enzyme) Structure EXAFS (Extended X-ray Absorbtion Fine Structure) দ্বারা জানা গেছে। উৎসেচকটির আংশিক আকৃতি এইভাবে লেখা ব্যায়ঃ-

এখানে Mo-এর জারণন্তর (Oxidation State) + (VI) পালের যে lonepair যুক্ত Nitrogen atomib আছে সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অংশগ্রহণ করে। নিচে উৎসেচকটির বিক্রিয়া কৌশল (Proposed Mechanism) দেখান হলোঃ

# MECHANISM OF OXOALLOPURINOL -A URIC ACID LOWEING DRUG.

Dr. Bireswar Mukherjee Department of Chemistry

বর্তমান সময়ে বহু লোক উচ্চ ইউরিক আসিডজনিত রোগে ভূগছেন।
সাধারণ মানুষের রক্তে ইউরিক আসিড মান Y-5 mg/L। প্রধানত প্রোটনজাতীয়
থাবার পরিপাকের সময় Uric Acid উৎপদ্দ হয়। যৌগটি মুত্রের মাধ্যমে শরীরের
বাইরে চলে যায়। Xanthine Oxidase এনজাইম আমাদের শরীরে Xanthine
কে জারিত করে (Oxidation) Uric Acid উৎপদ্দ করে। নিচে সংক্ষেপে বিক্রিয়াটি
(Net reaction বলা হলোঃ-

Xanthine Oxidase এর Structure জানা খুবই জরুরী কেননা শরীরে Xanthine এর মাত্রা (Concentration) বাড়তে থাকলে Uric Acid মাত্রাও শরীরে বাড়ে। Uric Acid এর কেলাস (Crystal) হাড়ের সন্ধিস্থলের রসে জমা হতে থাকে। ফলে ক্রমে ক্রমে আমে Uric Acid এর কেলাসের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে চলাচল করার সময় সন্ধিস্থলে হাড়ের সাথে কেলাসগুলির ঘর্ষণ (Friction) হয়। তার জন্য চলাচল করতে অসুবিধা হয়। একে আমরা বলি গেটে বাত। Uric Acid এর গাড়ের কমানোর সব থেকে সহজ্ঞ উপায় হলো প্রোটন জাজিয় খাবার কম বা না খাওয়া। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগটি বংশগত। ভা সজ্যেও যদি Concentration না কমে তাহলেই ঔবধের দরকার। বর্তমানে বছল প্রচলিত Oxo-anopurinol যৌগটি ব্যবহার করা হয়। Oxo-anopurinol এর যৌগটির আকৃতি Xanthine-এর খুবই সদৃশা ঃ-

এবার Oxo allopurinol এর কাজ হলো Xanthine Oxidase (Enzyme) এর কার্যক্ষমতা (activity) কমিরে দের। Xanthine Oxidase-এর আকৃতি (Structure) অতান্ত জটিল। সহজভাবে বলতে গেলে এর মধ্যে দুইটি Mo (Molybdenum) পরমানু (atom), চারটি Fe S অংশ (residue) এবং দুইটি FAD (Flavin) Adenine Dinucelotide) অংশ থাকে। এই উৎসেচকটির (Enzyme) Structure EXAFS (Extended X-ray Absorbtion Fine Structure) দ্বারা জানা গেছে। উৎসেচকটির আংশিক আকৃতি এইভাবে লেখা যায়ঃ-

এখানে Mo-এর জারণন্তর (Oxidation State) + (VI) পাশের যে lonepair যুক্ত Nitrogen atomib আছে সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশগ্রহণ করে। নিচে উৎসেচকটির বিক্রিয়া কৌশল (Proposed Mechanism) দেখান হলোঃ

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}$$

$$- Mo(IV) - NV + UNIC acid$$

$$- Mo(IV) - NV + UNIC acid$$

$$- H^{+}$$

$$- Mo(VI) - NV + 2\ell \rightarrow cell.$$
The electron carrier of the cell.

এখন নিয়মিত Oxo allopurnol যৌগটি (Compound) গ্রহণ করলে যৌগটি Xanthine Oxidase কে নিব্রিয় করে।

$$\frac{1}{2} \frac{1}{N} = 0$$

$$\frac{1}{N} = 0$$

$$\frac{1}{N$$

Inactirated Intramolecular H-bonded enzyme.

নিষ্ট্রিয় উৎসেচকটিতে Intramoleular H-bonded যৌগ উৎপন্ন হওয়াতে যৌগটি থ্বই স্থায়ী (Stable)। ফলে এর বিয়োজন আর সম্ভব হয় না। এর গাড়ত্ব রক্তে আন্তে অমতে থাকে। বোঝা যাচ্ছে যে Oxo allopurd গ্রহণ বন্ধ করে দিলে Uric Acid এর মাত্রা আবার বাড়তে থাকবে।

### Reference :-

- i) Inorganic Chemistry J.E. Huhuy
- Quest, An Academic Journal, Vol-2, 2006, P-9-12, HIV-Protease
   Uritibitor A New dimension in AIDS treatment Dr. B. Mukherjee.
- iii) Inorganic Chemistry Parcell & Kotz.

# QUANTUM TRANSFER EXPERIMENT (2D-INADEQUATE): 13C - 13C CONNECTIVITY

Dr. Bireswar Mukherjee Department of Chemistry

INADEQUATE Spectrum বর্তমানে জৈব রসায়নশাস্ত্রে বহল ভাবে বাবহাত হচ্ছে। সাধারণত আমরা যে সব জৈব যৌগ বাবহার করছি তার মধ্যে বেশির ভাগ <sup>12</sup>C। <sup>13</sup>C কার্বন থাকার সম্ভাবনা খ্বই কম। কারণ <sup>13</sup>c এর প্রাকৃতিক প্রাচ্য খ্বই কম। বলা বাহলা পাশাপাশি দুইটি <sup>13</sup>C — <sup>13</sup>C থাকার সম্ভাবনা আরও অনেক অনেক কম। দেখা গেছে যে 10,000 টি অনুর মধ্যে মাত্র একটিতে পাশাপাশি <sup>13</sup>C — <sup>13</sup>C থাকে। এই পরীকাটি করার জন্য খ্বই সূক্ষ যন্ত্র পাতির দরকার। বিশেষত জৈব যৌগের কার্বন শৃশ্বল জানার জন্য পরীকাটি বহল প্রচলিত।

Fig-I  $^{13}$ c-NMR এর প্রোটন decoupled বর্ণালীটি দেখান হলো। এগুলি একটি Singlet Line (A,B) দেখাছে। a- Signalটি  $^{13}$ C, থেকে এবং b Signalটি  $^{13}$ C, থেকে আসছে। আমরা জানি বে  $^{13}$ C এর ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার কোয়ান্টাম নাম্বার  $^{12}$ C

পাশাপাশি দুইটি <sup>13</sup>C-<sup>13</sup>C পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকার ফলে এটিকে

নির্ধারণ করতে গেলে উপরের Signal গুলি Double Quntum-Filter দ্বারা অপসারিত করা হয়। Fig-I চিত্রটি 'D বর্ণালী। Double Quntum Filter করার পর চিত্রটি দাঁড়াবে অনেকটা এই রকম (Fig-II):

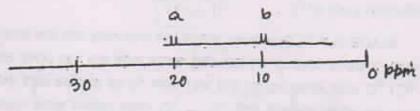


Fig-II

<sup>13</sup>C এর নিউক্লিয়ার কোয়ান্টাম সংখ্যা (I) <sup>1</sup>/<sub>2</sub> বলে a, b দুই singlet থেকে doublet হয়ে যাবে। a ও b এর Signalভলি খুবই দুর্বল ফলে তীরতা ও খুবই কম। Fig-II টি অতি সরলকৃত ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্ণালীটি আসলে বিমাত্রিক। <sup>13</sup>C টি পালের <sup>13</sup>C-র AX এর ন্যায় interact করছে। Inadequate বর্ণালী আরও ভালো ভাবে বৃশ্বতে গেলে নিচের কতগুলি যৌগের বর্ণালী সম্বজ্ঞা আলোচনা করা দরকার।

যেমন :- Example- 1, CH OH Methanol. এর ক্ষেত্রে AB—অক্ষটি সাধারণ <sup>13</sup>C বর্ণালীর মত দেখান হয়েছে। ABCD ক্ষেত্রটি একটি বর্গক্ষেত্র। যেহেত্

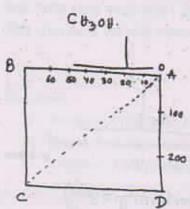


Fig-III, Approximate INADEQUATE Spectum

যৌগটিতে একটি মাত্র <sup>13</sup>C আছে সেহেতু একটি Singlet পাওয়া যাবে। AD অকটি Coupling তথ্য উপস্থাপিত করছে। AC line টিকে Diagonal axis বলে। ABCD ক্ষেত্রের মধ্যে অন্য কোন Signal দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ <sup>13</sup>C এর পালে অন্য কোন <sup>13</sup>C নেই।

Example - 11 CH, CH, OH
Ethanol যৌগটিতে দুইটি কার্বণ পরমানু
পাশাপাশি আছে। যৌগটির

INADEQUATE বর্ণাদীটি অনেকটা এই রকম দেখাবে।

এখানে A বৃত্তের অন্তর্গত 'II' এই বিন্দুটি doublet বোঝাছে। B বৃত্তের

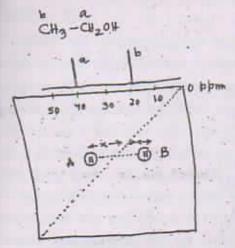


Fig-IV, Approximate INADEQUATE Spectum of ethanol

विन्सूर्ग doublet (वीवाह्यः) B वृद्धव অন্তর্গত চিন্হাট doublet (वावाह्यः) A doublet টি C - a থেকে এবং B doublet টি C - a - a ঠিক তলার আছে। অনুরূপে B - DOUBLET টি C - b - a ঠিক নিচে আছে। A ও B doublet টি diagonal axis থেকে একই দুরুত্বে অর্থাৎ x unit-এ আছে। এই x unit অর্থাৎ সমান মান বলে দিছে যে Ca এক Cb পরস্পরের পাশাপাশি আছে। যদি দেখা যেত যে দুরুত্বটি অসমান তবে Ca এবং Cb পাশাপাশি নেই।

(Example - III , CH, CH, OH n-Propyl alcohol

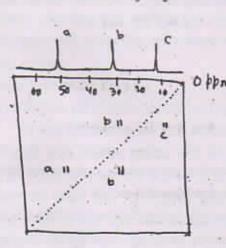


Fig-V, Approximate INADEQUATE Spectum of n-Propyl alcohol

বর্ণালীটিতে 'II' চিহ্নগুলি
doublet দেখাছে। Ca Singlet এর
নিচে একটি doublet a, Cb Singlet

০ ৮৮ টির নিচে দুই doublet b এবং Cc
Signal এর নিচে একটি doublet
C দেখাছে। এখন a doublet টি b
- doublet থেকে কৌণিক রেখার
সাপেকে সমদুরত্বে আছে। সূত্রাং বলা
যায় যে Ca এবং C, carbon গুলি
পাশাপাশি আছে। ক্ষেত্রের উপরের অংশ
b-doublet ও c- doublet কৌণিক
রেখার সাপেকে সমদুরত্বে আছে। অর্থাৎ
Cb ও Cc - carbon দুইটি পাশাপাশি
অবস্থান করছে। এর থেকে বলা যায়

যে Ca - Cb এবং Cb - Cc সরাসরি একে অপরের সাথে যুক্ত।

(Example - iv) CH<sub>3</sub>-CH(OH) - CH<sub>2</sub> CH<sub>3</sub>, 2 - butanol
আমাদের শেষ উদাহরণটি 2 - butanol এর <sup>13</sup>c - NMR এ বিভিন্ন

কাবর্নের Chemical Shift Position আমরা আগেই জানি। a, b, c এবং C কার্বণ পরমানুর বিভিন্ন Chemical Shiftএর মান উপরে দেওয়া আছে। Cd doublet টি Ca-এর সাথে সমদূরত্ব রেখা
দিয়ে দেখানো হয়েছে। আবার Cd টি Cb
-এর সাথে সরাসরি যুক্ত বক্ররেখা ছারা
চিহ্নিত। একই ভাবে Cc এবং Ca carbon দুইটি পরস্পরের সাথে সরাসরি
যুক্ত। একই ভাবে অন্যান্য কার্বণগুলিও
দেখান যায়।

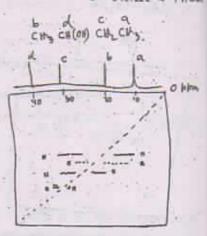


Fig-VI: Approximate INADEQUATE Spectum of 2 - butanol

#### Reference :-

- Spectrometric Identification of organic compound 5th edition, Silverstein, Bassler, Morrill
- (ii) Spectrosopic Methods in Organic Chemistry Williams & Fleming, 4th edition
- (iii) For more complex analysis of INADEQUATE Spectrum see Spectrometric Identification of Organic Compound, 5th edition, Silverstein, Bassler, Morrin.

# নতুন স্র্য্য দ্যণমুক্ত পরমানু শক্তি দাও

ডঃ গোপেন্দ্র নাথ রায় ইরোজী সাহিত্য বিভাগ

ভূমিকা - সূর্য্য পৃথিবীতে শক্তির মূল উৎস। সূর্য্য থেকে উম্ভূত বিশাল পরিমান শক্তির 50 কোটি ভাগের এক ভাগ পৃথিবীর আবহমন্ডলে এসে পোঁছার আবহ মন্ডলে যে পরিমান শক্তি প্রবেশ করে তার 47% পৃথিবী পৃষ্ঠে পোঁছার। এই 47% এর 4% পৃথিবী পৃষ্ঠে থেকে প্রতি ফলিত হয়ে মহা শূনো ফিরে যার। বাকী শক্তি জীবজ্ঞগৎ প্রতাক্ষ ভাবে ভোগ করে । এই শক্তির একটি অংশ পৃথিবীতে শক্তির আধার হিসাবে বিভিন্ন জড় পদার্থে সঞ্চিত হয় । কালক্রমে তাদের প্রকৃতিক শক্তির উৎস হিসাবে (বেমন- কাঠ, করলা, জ্বালানী তেল ইত্যাদি) বাবহার করা হয় ।

মানুবের জীবন বাপনে শক্তির প্ররোজন অপরিহার্য। আধুনিক যুগে এই শক্তি প্রধানত বিদৃং শক্তি রূপে ব্যাবহৃত হয়। সভ্যতার বিকাশ কারিগরি ও প্রযুক্তিগত বিকাশের সাবে জড়িত-এর জন্য চাই অকুরস্ত শক্তি, অঘচ যে সব উৎস থেকে আমরা শক্তিপাই, তাদের কতকগুলির মজৃত ভাশ্ডার ক্রমশ কমে আসহে - সেজনা করেক দশক পরে শক্তির অনটনের প্রবল সম্ভাবনা । এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে যদি বিজ্ঞানীরা নতুন সূর্যা তৈরী করতে পারে। বলা বাছলা- এই নতুন সূর্যা এক ধরনের কৃত্রিম সূর্যা যা সূর্যোর চেয়ে অনেক ছোট কিন্তু প্রকৃতিতে প্রায় একই রকম। এটা সম্ভব হলে পৃথিবীতে দ্বন মৃক্ত পরমানু শক্তি উৎপাদনের সমস্যা চিরকালের জন্য সমাধন হয়ে যাবে। কাজটি সহজ নয়।এই কাজ বর্তমান শতাব্দীর বড় চ্যালেল্ল।

পারমানবিক শক্তির উৎস :

## (৯) বিভাজন চুলী (FISSION REACTOR)

যে যত্রে ইউরেনিয়াম-235 ভারী আইসোটোপকে মন্থর নিউটনের সংঘাতে ও নিয়ন্ত্রিত শৃষ্ণ বিক্রিয়ার সাহায্যে শক্তি উৎ পর হয় — তাকে বিভাজন চুলী বা পরমানু চুলী বলে। মাত্র এক পাউন্ড U235 ব্যাবহার করে 1MW হারে শক্তি এক বছর ধরে পাওয়া বায়। পরমানু চুলীর জালানী প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম বার সঞ্চয় পৃথিবীর বুকে সীমিত। তাই কয়েক দশক পরে এই বিভাজন চুলীর ব্যাবহার বন্ধ হয়ে যাবে। এর ব্যাপক ব্যাবহারে সমস্যা আছে। এই চুলীর তেজজ্ঞীয় আবর্জনা ও বিক্রিয়ন জর্নিত ঘটনায় মানুষ ও তার ভবিষাৎ জীবন এবং আশেপাশের জীবজগতের নানাবিধ ক্ষতির সম্ভবনা আছে। পৃথিবীতে যত ইউরেনিয়াম আছে তা সম্পূর্ন ব্যাবহার করলে মাত্র 50 বছরের মধ্যেই সেই ভান্ডার ফুরিয়ে যাবে।

পরমানু শক্তি দরকার, অথচ এই শক্তি ব্যাবহারের পথে এত বাধা ও সমস্যা।

তাই ভবিষাতে সংযোজন চুলী তৈরী হলে সব বাধা দূর হয়ে যাবে। এর তর এবং সম্ভাবা রূপ কী ?

(২) সংযোজন চুলী (FUSION REACTOR) [नजून সूर्य]:

যে যদ্রে নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় একাধিক হান্দ্রা পরমানু কেন্দ্রক যুক্ত হয়ে একটি কেন্দ্রকে পরিনত হয় এবং প্রচন্ড শক্তি উৎপন্ন হয়- তাকে বলে সংযোজন চুল্লী। সাধারন ভাবে এতে হাইড্রোজেন আইসোটোপ ডয়টেরিয়াম (d) ও টিটিয়ামের (t) হান্দ্রা পরমানুর নিউক্লিয়ামের সংযোজনের ফলে যে বিপুল শক্তি উৎপন্ন হয়- তা 'কৃত্রিম সূর্যা' বা 'নতুন সূর্যের' রূপ নেয়। এই তাপমাত্রাকে স্টীম টারবাইন যদ্রের সাহায়ে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

সামৃদ্রের জলের অনুতে বে হাইডোজেন আছে তার 6500 ভাগের একভাগ হল 
ডয়টেরিয়াম। ঐ জলরাশির পরিমান সৃবিশাল হওয়ার মজুদ ডয়টেরিয়ামের পরিমান 
ও যথেষ্ট। এক লিটার জলে যেটুকু ডয়টেরিয়াম আছে, তার থেকে যে শক্তি পাওয়া 
যায়- তা 350 লিটার পেটোলের শক্তির সমান। সূতরাং সংযোজন চুল্লীর দ্বারা প্রাপ্ত 
শক্তির ব্যাবহার্রিক প্রয়োগ করলে পৃথিবীতে শক্তি সমস্যার সমাধান চিরকালের জনা 
হয়ে যাবে।

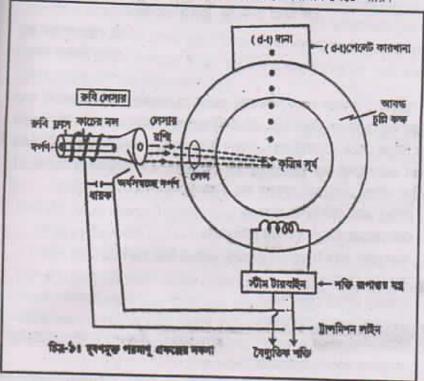
সংযোজন চুল্লী নির্মালের কৌশল :

সংযোজন পদ্ধতি সাফল্য মন্ডিত করতে উচ্চ তাপমাত্রা (10<sup>7</sup> বা 10<sup>6</sup> °C)
প্রয়োজন। এই তাপমাত্রা নিউক্লিরার বিভাজন দারা বিক্লোরণ ঘটিয়ে করা যায়। এই
তাপমাত্রার গ্যাস আয়নিত হয়ে প্লাজমার পরিণত হয়।এইরূপ অত্যুক্ত উক্ষতা সম্পন্ন
প্লাজমাকে প্রয়োজন মত দীর্ঘ সময়ের জন্য কোন আধারের মধ্যে (টোম্বক বোতল)
আবদ্ধ রাখা,যতে প্লাজমা মধ্যস্থ ভারী আয়ন গুলি (d,t কেন্দ্রক গুলি) পারস্পারিক
সংঘাতের ফলে সংযোজন বিক্রিয়া অনুষ্ঠিত করে শক্তি উৎপাদন করতে পারে।

d+t → <sup>4</sup>He+n+17.58mev n= নিউটন, <sup>4</sup>He(আলফা কণা) উৎপদ্ম শক্তিকে mev এককে লেখা হয়েছে। mev= মিলিয়ন ইলেকটন - ভোল্ট। পরমানু বিদ্যুৎ প্রকল্প :

া বর্তমানে প্লাজমাকে উত্তপ্ত কারার জন্য যে পদ্ধতিটি উল্লেখযোগ্য সারা ফেলেছে তা হল- অতি তীব্র লেসার রশ্মী দ্বারা প্লাজমার উদ্ধাসন। চিত্র-১ কে এই রশ্মিকে ক্ষুদ্রাকৃতি (d-t) খন্ডের উপর নিক্ষেপ করে নিমেবের মধ্যে উব্ধ প্লাজমায় রূপান্তরিত করা হচ্ছে। প্রথমে সংকোচনের ফলে তার ঘনত্ব বেড়ে যায়। অন্ত:ক্ষোরর্নের (Implotion) ফলে প্রচুর তাপ ও চাপ (10<sup>12</sup> atm) [সূর্যোর থেকে ও ১০ গুন বেশী] উৎপল্ল হয়। যা নতুন সূর্যা (বা কৃত্রিম সূর্যের) আকার ধারণ করে। এই সূর্যা আকারে ছোট - কিন্তু ক্ষুদ্র কুদ্র হাইড্রোজেন বোমার বিক্ষোর্লের কথা মনে করিয়ে দেয়।

পরপর বিস্ফোরর্চের ফলে আনবিক শক্তির ধারাবাহিক যোগান পেতে পারি।



যদি 0.1 মি. গ্রাম খন্ড প্রতি সেকেন্ডে দহন করা হয়, তাহলে গড় তাপশক্তির পরিমান 1gw যা 300mw তড়িং শক্তি উৎপাদন করতে সক্ষম। এই তড়িং শক্তি কোন মহানগরী তে 175,000 জনের তড়িং শক্তির চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট। উপসংহার:

মানব সভাতার ভবিষাতের কথা চিন্তা করলে নতুন সূর্য নির্মাণের গুরুত্ব অপরিসীম, গত প্রায় ৩৫ বছর ধরে বিভিন্ন দেশে নানান প্রযুক্তি বিদ্যা ও কম্পিউটার বিশ্লেষদের সাহায়ে এই বিষয়ে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। বাণিজ্যিক ভিন্তিতে সংযোজন চুল্লীর ব্যবহার হতে আরোও কয়েক বছর লাগবে। ভারতে 2006 সালে ইন্টারন্যাশন্যাল থার্মোনিউক্লিয়ার এক্সপেরিমেন্টাল রিয়াক্টর (ITER) চালু হয়েছে। এই চুল্লীতে নিয়ন্ত্রিত সংযোজন প্রক্রিয়া থেকে তড়িং শক্তি উৎপাদনের চেন্টা চলছে। করু থেকে আজ পর্যন্ত গবেষণা ও উন্নতির ধারা ভারতের পরমানু শক্তিবিভাগ সুঠভাবে বজার রেখেছে। আশা করি সংযোজন চুল্লী নির্মাণের ক্ষেত্রে ও ভারত তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে পারবে।

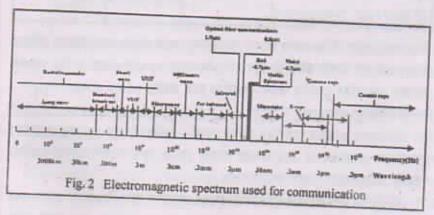
চালেল হিসাবে কাজ করে। তাই এই ধরনের যোগাযোগ বাবস্থাকে বেতার (wireless) যোগাযোগ বাবস্থা বলা হয়। রেডিও যোগাযোগ বাবস্থা মূল উপাদানগুলি ১নং চিত্রে দেখানো হরেছে। এক্ষেত্রে প্রেবক যন্ত্রে তথাযুক্ত সংকেত আনটেনার মাধামে তড়িংচ্ছুম্বকীয় তরঙ্গ হিসাবে সম্প্রসারিত হয়ে থাকে। গ্রাহক যন্ত্রে এই সংকেত ধরা পড়ে এবং তা থেকে প্রয়োজনীয় তথা উদ্ধার করা হয়।

রেভিও যোগাযোগ দুভাবে হতে পারে।

- ১) রেডিও টেলিফোনী এক্ষেত্রে তথ্য বা সংক্রেত রেডিও তরঙ্গের সাহায্যে এক দ্বান থেকে অন্য স্থানে প্রেরন করা হয়। এখানে বাহক তরঙ্গের উপর সংক্রেতকে মড্লেসন (modulation) নামক প্রক্রিয়ায় মিশ্রিত করে পাঠানো হয়।
- ২) রেভিও টেলিগ্রাফী এক্ষেত্রে সংবাদ বা তথ্য একটি বিশেষ কোডের সাহায্যে নিরবিছিন রেডিও তরঙ্গকে পরিবর্ভিত করে পাঠানো হয়।

তড়িৎ চুম্বকীয় বর্নালি :

তড়িং চুম্বনীয় তরঙ্গের কম্পান্ত শূনা থেকে অসীম পর্যন্ত যে কোনো মানের হতে পাত্রে এবং তদন্যায়ী তরঙ্গে দৈর্ঘ্যের অসীম থেকে শূনা পর্যন্ত বিস্তৃত পাপ্লার ভিতর থাকরে। কম্পান্ত বাড়লে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে কমে এবং কম্পান্ত কমলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে বাড়ে। সাঞ্জাবা সকল কম্পান্ত বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তড়িং চুম্বকীয় তরঙ্গকে একবোগে তড়িং চুম্বকীয় বর্নালী (spectrum) বলে।



চিত্র ২তে ইন্টারন্যাশানালে টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন কৃঠক যোগাযোগ ব্যাবস্থার বাবহৃত তড়িং চুম্বকীয় বর্নালী দেখানো হয়েছে। বেতার তরঙ্গ তড়িং চুম্বকীয় বর্নালীর একটি অংশ। বেতার তরঙ্গের পাল্লা হল 10 KHz থেকে 300GHz. স্বিধার জনা এই বৃহৎ কম্পান্ত পাল্লাকে ছোট ছোট পাল্লার ১নং ধারনীতে ভাগ দেখানো হয়েছে।

সারণী - ১				
পদীর নাম	কম্পাংকের পালা	জ্বন দৈর্ঘ্যের পালা	ব্যবহার	
অতান্ত নিম্ন কম্পাংক (VLF) (Very Low Frequency)	10-30 KHz	30-10 Km	দীর্ঘ পাল্লা যোগাযোগ	
নিম্ন কম্পাংক (LF) (Low Frequency)	30-300 KHz	10-1 Km	ভাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে	
মাঝারি কম্পাকে (MF) (Medium Frequency)	300KHz- 3 MHz	1km-100m	বেতার সম্প্রচার	
উচ্চ কম্পাংক (HF) (High Frequency)	3-30 MHz	100m-10m	যে কোলো ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থায়	
অতি উচ্চ কম্পাংক (VHF) (Very High Frequency)	30-300MHz	10m-1m	T.V. রাভার, হুস্থ তরঙ্গ যোগাযোগে	
আত্ৰী উচ্চ কম্পাংক (VHF) (Ultra High Frequency)	300MHz- 3 GHz	1m-10cm	রাডার, মাইক্রো তরঙ্গ যোগাযোগ	
পুপার উচ্চ কম্পাংক (SHF) Super High Frequency)	3-30 GHz	10-1cm	রাডার, উপগ্রহ যোগাযোগ	

বেতার তরঙ্গ বিভিন্ন ভাবে প্রেরক আানটেনা থেকে গ্রাহক আনটেনাতে পৌছতে পারে। প্রধানত তিনটি স্বতন্ত্র উপায়ে ১) ভূমি-তরঙ্গ ২) দেশ -তরঙ্গ ও ৩) আকাশ তরঙ্গের রূপেতড়িং চুম্বকীয় তরঙ্গ সঞ্চালিত হয়ে থাকে।

টেলিডিশন সম্প্রচার :

টেলিভিশন কথাটির অর্থ "দূর হইতে দেখা"। এজন্য ইহাকে দূরদর্শন বলা হয়।
দূরদর্শন বা সংক্ষেপে (T.V.) বলতে আমরা কোনো দৃশ্য বা ছবি একস্থান হইতে
দূরবতী কোনো স্থানে প্রেরণ করা বোঝায়।

টেলিভিশন দৃশ্য সংকেত দূরে বেতারযোগে প্রেরণের জন্য বিস্তারগত প্রকম্পনের সাহায্য নেওয়া হয়, টেলিভিশনের বাহক তরঙ্গ 56 থেকে 216 এবং 470 থেকে 890 MHz এই দৃই পরিধির মধ্যে থাকে। টিভিডে প্রকম্পক সংকেতে দৃশ্য সংকেত ছাড়া আর ও কয়েটি সংকেত থাকে - ইহাদের সমন্বয়কারী সংকেত (Synchronizing signal) বলে। দৃশ্য সংকেত ও সমলয়কারী সংকেতকে যুগ্মভাবে ভিডিও (Video) সংকেত বলা হয় এবং ইহার সাহায্যে টিভির বাহক তরঙ্গকে প্রকম্পিত করা হয়।

সমলরকারী সংকেত ব্যবহার করার জন্য টিভির প্ররেক ও গ্রাহক যন্ত্রের মধ্যে সমলর সাধন করা হয় - যার ফলে গ্রাহক যন্ত্রের ছবি সৃষ্থিত (Steady) হয়। টেলিভিশনে দুশার সহিত শাবা সংকেত প্রেরণ অপর একটি বাহক তরঙ্গের সাহাযো করা হয়। এক্ষেত্রে কম্পাঞ্জ্যত প্রকম্পন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্রে গৃহিত প্রকম্পিত বাহক তরঙ্গটিকে পর্যারক্রমে বিবর্ষিত স্পার হেটেরোজইন প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত নিম্ন কম্পাকে পরিবর্তিত ও সমসাধিত করা হয়। সমসাধানের দরুল পাওয়া প্রকম্পক সংকেতটি হইতে পরে ভিডিও ও শ্রোবা কম্পাকের সংকেত পৃথক করিয়া লওয়া হয়। প্রথম সংকেতটিকে একটি দৃশ্য নলে (Picture Tube) এবং দ্বিতীয় সংকেতটিকে লাউড স্পীকারে প্রয়োগ করা হয়।

# (ii) টেলিকোনের মাধ্যমে দ্রপালা যোগাযোগ :

সংক্রেত বা তথা একস্থান থেকে অন্যন্থানে চ্যানেলের মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়ে থাকে। টেলিফোন ব্যবস্থায় চ্যানেল হিসাবে কাজ করে টেলিফোন তার। মর্তমানে সারা বিশ্বে টেলিফোন যোগাযোগের অত্যন্ত দ্রুত প্রসারের দরল যোগাযোগ কৌশলে নানান উদ্ভাবনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এরকমই একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হল আলোকীয় তত্ত্ব (Optical Fibre)। আলোকীয় তত্ত্বর প্রয়োগে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়ন প্রসার ঘটেছে তা আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

भाषास्मत्र मथा मिरा जवालन :

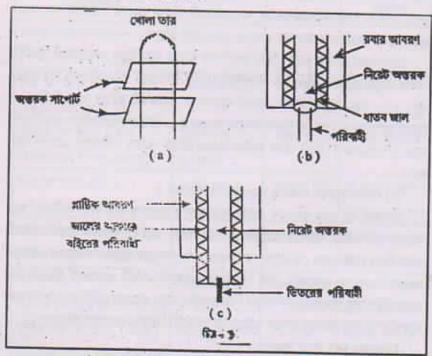
ভূমিকা: যোগাযোগ ব্যবস্থার তথা সংকেত সাধারনত তির্বক তড়িচ্ছুস্বকীর (Transverse) (Electro Magnetic or TEM) তরঙ্গ বাহকের সাহায্যে সঞ্চালিত হয়। এই সঞ্চালন যে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে হয় তাকে সঞ্চালক মাধ্যম বলা হয়। সঞ্চালক মাধ্যম দুরকম হয়।

১) গাইডেড (Guided) মাধ্যম, ২) আনগাইডেড (Unguided) মাধ্যম। গাইডেড মাধ্যম এমন মাধ্যম যেখানে (TEM) তরক্ষের সঞ্চালনের অভিমুখ মাধ্যম ছারা নিয়প্রিত হয়- যেমন অমার তার। আনগাইডেড মাধ্যম তরঙ্গ বাহকের পথ নির্দেশ করেনা - যেমন বায়ুমন্ডলের মধ্য দিয়ে তড়িং চুম্বক তরঙ্গের সঞ্চালন। গাইডেড মাধ্যম তথুমাত্র তরিং চুম্বকই তরঙ্গ সঞ্চালন করে না - সাধারন বৈদ্যুতিক সংকেত ও সঞ্চালিত হয়। সকলরকম তার যোগাযোগ - যেমন সাধারন টেলিফোন যোগাযোগ এবং স্থানীয় কমপিউটার নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে গাইডেড মাধ্যমে বাবহৃত হয়। গাইডেড মাধ্যমকে সঞ্চালন পথ (Transmission line) বলে।

সাধারনত তিনরকম সঞ্চালন পথ ব্যবহৃত হয়।

১) খোলা তারের পথ (Open wire line)

- ২) সুরক্ষিত যুগল পথ (Shielded pairtied)
- ৩) সমাক্ষীয় পথ (Coaial line)



চিত্র-৩-এ তিনরকম সঞ্চালন পথ দেখালো হয়েছে।

- খোল তারের পথ তুলনামূলক ভাবে সন্তা এবং কার্যকরী। প্রধান অসুবিধা হচ্ছে উচ্চহারে বিকীর্ন শক্তির অপচয়।
  - त्रृतिक्ठ गृगन পथ जलक উन्नठमालत भथ।
- ত) সমাক্রীয় পথ বা কেবল পথ অনেক উন্নতমানের সঞ্চান পথ। কোন কেবল যে পালায় কম্পাক সঞ্চালিত করে তাকে বাান্ড প্রস্থ (Brancd Width) বলে। সঞ্চালনের বাান্ড প্রস্থ কেবলের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে।

1Km দৈর্ঘ্যের সমান্ধীয় কেবল সেকেন্ডে 1 GB (1 giga bite - 2<sup>30</sup>bite) পর্যন্ত সংক্রেত সঞ্চানন করতে পারে। সমান্ধীয় কেবলগুলি দূভাবে বিভক্ত - (১) বেস ব্যান্ড (base band) এবং ব্রড ব্যান্ড (Broad band)। বেস ব্যান্ড কেবল অংকিত তথা সঞ্চালনের (digital data transmission) জন্য ব্যবহৃত হয়। ব্রড ব্যান্ড কেবল ব্যবহার আনালগ ও ভিডিও সংক্রেত সঞ্চালনের জনা। 10 থেকে 100km দূরত্বে 450MHz পর্যন্ত ভিডিও সংক্রেত স্ঞালনের জন্য ব্রড ব্যান্ড কেবল ব্যবহার হয়।

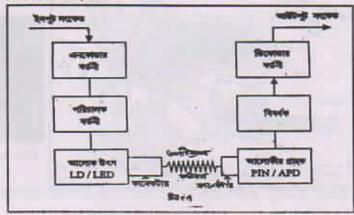
## (iii) আলোকীয় তন্ত (Optical Fibre)

তড়িং চুম্বকীয় এরল সংগ্রালনের ক্ষেত্রে গাইডেড মাধ্যম তার বা কেবল ছাড়া ও ব্যবহার হচ্ছে আলোকীয় তত্ত্ব। আলোকীয় ততুর ব্যবহার যোগাযোগ ইঞ্জিনিয়ারিং এ এক মুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে।

কেবল এর তুলনায় আলোকীয় তন্তু ব্যবহারের সুবিধা :

- (১) ইহার ওজন খুবই কম
- (২) এই ততুর নমনীয়তা (flexibility) এত অধিক যে ইহাকে কয়েক সেমি ব্যাসার্জের বৃত্তপথে ও বাঁকান যায়।
- (৩) সংক্রেত সরবরাহ ক্ষমতা তুলনামূলক ভাবে বেসি (সেকেন্ডে 2.5 GB পর্যান্ত)।
- (৪) এই তত্ত্ব সাহায্যে একসাথে অনেকন্তকি চ্যানেলে সঞ্চালন সন্তব। যার
  ফলে তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী তথ্য সরবরাহে সক্ষম।
- (৫) ফাইবার তড়িৎ পরিবাহী নয়, য়য় ফলে বাইরের বিদ্যুত ও তড়িৎ চুম্বকীয় সংকেত থেকে সঞ্চালন পথকে সুরক্ষিত করার আলাদা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না।
- (৬) সঞ্চালন ক্ষমতা হ্রাসের মাঝা (attenuation) অনেক কম ( 0.1db/km থেকে 3db/km)।
- (৭) এখানে TEM তরঙ্গ হিসাবে আলোক তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় যার কম্পান্ত
   (=10<sup>15</sup>Hz) সাধারন মাইক্রোওয়েড বেতার তরক্তর তুলনায় বেশী
  - (iv) যোগাযোগ ব্যবস্থায় তন্তু (Fibres in comunication system) :

চিত্র 4 এ আটিকাল ফাইবার যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্লক চিত্র দেখানো হরেছে, এই ব্যবস্থার মূল অংশ তিনটি ১) আলোকীয় সঞ্চালক (Optical transmitter) ২) আলোকীয় গ্রাহক (Optical receiver) এবং ৩) আলোকীয় সংযোগ মাধ্যম অর্থাৎ অপটিক্যাল ফাইবার।

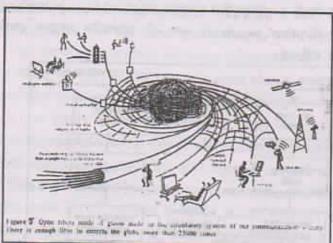


আলোকীয় সঞ্চালকের কাজ হল বৈদ্যুতিক সংকেতকে আলোকীয় (অর্থাৎ তৃড়িৎ চুম্বকীয়) সংকেতে পরিণত করা এবং ঐ সংকেত অপটিক্যাল ফাইবার প্রবেশ করানো। এই ট্রান্সমিটার বা সঞ্চালকে থাকে একটি আলোর উৎস এবং প্রকম্পক (মড়ালেটর)। আলোর উৎস হিসাবে লেসার ডায়োড (LD) এবং আলো নিঃসরক ডায়োড (LED) বাবহর করা হয়। লেসার উৎসের মড়ালেশন ব্যান্ড প্রস্থ 10GHz পর্যান্ত হয়।

এছাড়া সঞ্চালকের দিকে এনকোডার বর্তনী এবং একটি পরিচালক বর্তনী (Driver Circuit) ছাড়াও কানেকটর (connector) ইজাদি কয়েকটি গৌন অংশ থাকে।

আলোকীর বাহক তরঙ্গকে মড়ালেট করে আলোকীয় সংক্রেতে পরিণত করে অপটিক্যাল ফাইবারে প্রবেশ করে তা ঐ ফাইবারের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়ে আলোকীয় গ্রাহকে আসে। আলোকীয় গ্রাহক আসলে একটি ফটো ডিটেকটর। ফটো ডিটেকটর হিসাবে সাধরনত PIN ফটো ডায়োড বা APD (Avalanche Photo Diode) বাবহৃত হয়। এইভাবে গৃহীত সংকেতকে সমসাধিত (Demodulate) করে বিবর্ধক বর্তনীর মধ্য দিয়ে ডিকোডার (decoder) বর্তনীতে প্রেরণ করা হয়। এই ডিকোডেড (decoded) সংকেতই আউটপৃট সংকেত।

যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য 2009 সালের পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বর্তমানে বৃটিশ নাগরিক চার্লস কুয়েন কাও। জন্ম চীনের সাংহাই শহরে। ইমপিরিয়াল কলেজ,লন্ডন থেকে 1995 সালে পিএইচডি ডিগ্রি করেন। ইউকে তে দ্যান্ডান্ড টেলিকম্নিকেশন লেবরেটারিস-এর ডিরক্টর ছিলেন। পরে হংক্তে চাইনিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে 1966 সালে অবসর গ্রহন করেন।





Charles K. Kao

1966 সালে কাউরের ফইবার অপটিকসে গুরুত্বপূর্ণ আবিস্কার বিশেষ সাফল্য মন্ডিত হল। 1960 সময়ে আলোকীয় ততুর বারা মাত্র 20 কিমি দ্রত্ব পর্যন্ত সংকেত পাঠানো যেত। সবথেকে গুরু (purest) কাচের তৈরী ফাইবারের সাহায্যে অধ্যাপক কাউ 100 কিমি দ্রত্ব পর্যন্ত আলোক সংকেত সঞ্চালিত করতে সক্ষম হলেন 1966 সালে। এর চার বছর পরে 1970 সালে অতিগুরু (ultrapure) ফাইবার সফলভাবে তৈরী করা হল। চিত্রে-5 দেখানো হয়েছে এই কমলক্তি ক্ষয় (low-loss) ফাইবারের সাহায়ে। ইনটারনেট সহ বিশ্বব্যাপী রড ব্যাল্ড যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। আলো গ্লাসের তৈরী ছোট ফাইবারের সাহায়ে একয়েছা 100,000 এর ও বেশী গুতি সংকেত কয়েক কিলোমিটার দ্রত্বে প্রেরন করা সম্ভব। ফাইবারের সাহায়ে তথ্য,গান,ছবি এবং ভিভিও মৃহূর্তের মধ্যে সমগ্র বিশ্বে সঞ্চালন করা সম্ভব। এছাড়া ইমেজিং সেমিকন্ডাক্টর সার্বিট, সিসিডি সেন্সরের অভূত পূর্ব আবিস্কারের জনা উইর্লাড এস বয়েল এবং জর্জ ই শ্রিথ 2009 সালে চার্লস কয়েন কাও সঙ্গে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এদের জীবনী শেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

iv) অনুত্রঙ্গ যোগাযোগ (microwave communication)

অনুতরঙ্গ বলতে প্রায় 1 থেকে 100GHz পাল্লার ভিতর কম্পাংক বিশিষ্ট তডিং চুম্বকীয় তরঙ্গ বোঝায়। এগুলি দেশ তরঙ্গরূপে একস্থান থেকে অপর স্থানে সঞ্চালিত হয়। এই দেশ তরঙ্গের মাধ্যমে সঞ্চারকে প্রশস্ত পটি বলা হয় কারন এক্ষেত্রে পটি বেধের মান প্রায় 100GHz এটি বেতার সঞ্চারের তুলনায় প্রায় 10,000 গুন বেশী। সেশ তরঙ্গ সরলরেখার প্রবাহিত হয় বলে এর সাহায্যে দুরবর্তী স্থানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন সম্ভব নয়। তবে সমযোগ গ্রন্থি (Link station) এর সাহায়ে এই সীমাবদ্ধতা অনেকটাই দুর করা যায়।

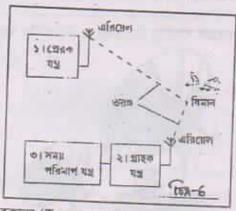
থ) যোগাযোগ ব্যবস্থার সবচেয়ে বিস্ময়কর ও আকর্ষণীয় যয় 'রাভার'



वकानादक कानवात এवर व्यक्तमातक क्रमवात म्ल्या मान्यात व्यक्तक पित्नत।

আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ অনেক রহসাময় জিনিস আবিস্কার করেও ক্ষান্ত হয়নি। বরং তার জানার ইচ্ছা আরও বেড়েছে। বিশ্বযুক্তের আগে বিজ্ঞানীরা মানুষের কল্যাণকর কাজের জন্য নতুন নতুন যন্ত্র আবিস্কার করতেন। কিন্তু বিশ্বযুক্ত আরম্ভ হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা অনেক রকম মারণান্ত্র নিছক প্রতিরক্ষার জন্য আবিস্কার করেছেন। মিতীয় বিশ্বযুক্তে ইংল্যান্ড এবং অন্যান্য কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশ বখন ঘন ঘন বিমান আক্রমণে পর্যুদ্ধ তখন বিজ্ঞানীরা একটি প্রতিরোধক যদ্রের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। আবিস্কৃত হয় রাভার। মেঘ কুয়ালা বা অন্ধকারের আড়ালে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে শক্রপক্ষের বিমানের অবস্থান সঠিকভাবে জানা গেল রাভারের সাহায়ে। রাভার মিতীয় বিশ্বযুক্তের এক বিশ্বয়কর সৃষ্টি।

রাজার একটি সাংক্রেতিক সংক্রিপ্ত শব্দ। ইংরেজী বাক্য Radio Detection And Ranging এর শব্দগুলির প্রথম অক্ষর পর পর সাজিয়ে এর উৎপব্তি। একে বাংলা করে বলতে পারা যায় 'বেতার তরদের সাহায়ে অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে দূরত্ব নির্ণয়।' ফাঁকা মাঠে জােরে কথা বললে দূরের প্রকাণ্ড দেওয়াল বা বৃক্ষশ্রেণি থেকে তার ধ্বনি তনতে পাওয়া যায়। শব্দ এর প্রকার তরঙ্গ। ঐ তরঙ্গ দেওয়ালে ধাজা খেয়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আমে। শব্দের যাওয়া ও আসার যে সময় লেগেছে তা গলৈ ঘড়ির সাহায়ে জেনে দেওয়ালের দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। বেতার তরঙ্গের সাহায়ে অনুরূপভাবে বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করা হয়। যেহেতু বেতার তরঙ্গের গতিবেগ শব্দের গতিবেগের তুলনায় অনেক বেলি এক্ষেত্রে সময়ের বাবধান এত অল্প যে সূজ্ব ছাড়া বোঝার উপায় নেই। এর জনা ইলেকটানিক অসিলােরােগ (Oscilloscope) বাবহার করা হয়। রাডার যয়টি নিয়লিখিত যয়াংশ ছারা গঠিত : (চিত্র-৪):



- ১) বেতার প্রেরকয়ন্ত্র (Transmiter)
- ২) বেতার গ্রাহকমন্ত্র (Receiver)
- ৩) সময় পরিমাপক যন্ত বা অসিলোন্ডোপ (Oscilloscope)

প্রেরক যন্ত্র থেকে ক্ষণকাল পর পর তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এরিয়েলের সাহাযো যে কোনো নির্দিষ্ট দিকে পাঠানো হছে। ঐ তরঙ্গ বিমান গাত্রে প্রতিফলিত হয়ে গ্রাহক যন্ত্রের এরিয়েলে ধারা পড়েছে। তারপর গ্রাহক যন্ত্র থেকে তড়িৎ স্পন্দন (Pulse) রূপে সময় পরিমাপক যন্ত্রে প্রবেশ করে। অসিলোজ্যোপের পর্দার খাড়াভাবে দণ্ডায়মান দীর্ঘ আলোক রেখা (যা প্রেরক যন্ত্র থেকে সোজাসুজি এসেছে) এবং ছোটো আলোক রেখা (যা বিমান থেকে প্রতিফলিত হয়ে এসেছে) দেখা যায়। এই দুই আলোর বাবধান থেকে বিমানের দূরত্ব নির্দায় করা যায়। আজকাল স্বয়ংক্রিয় ইলেকটনিক যন্ত্রের সাহায়ে বিমানের গতিবেগ ও দূরত্ব সঙ্গে সঙ্গেই নির্দার করা যায়।

অন্ধের যন্তির বৈমানিকেরা রাডারকে অবশয়ন করে বিমন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে এবং নির্বিদ্ধে বিমানবন্দরে অবতরন করে। মাঝ দরিয়ার ঘন কুয়াশা ও অন্ধকারের মাঝে দিশাহারা নাবিক পার পথের সন্ধান। এর সাহাযো প্রতি মিনিটে উদ্ভাপাতের সংখ্যা নির্ণার করা হয়। পৃথিবীতে বসেই রাডারের সাহাযো রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবেগ নির্ণার করা হছে। কৃত্রিম উপগ্রহে রাডার বসিয়ে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহে অনুসন্ধান কার্য চলছে। পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দুরত্ব নির্ণায় রাডারের দান অনস্থীকার্য। আবহবিদ গন এর সাহাযো ঝড় ও ঘূর্ণিবার্ডার কেন্দ্রন্থল ও গতিপথ নির্ধারণ করেন। ভূগর্ভন্ম খনিজ্ঞ পদাথ ও তেলের অনুসন্ধানের জনা রাডার ব্যবহার করা হছে। ব্যবহারের গতি পথ নির্দায় জনা ব্যবহার চলছে।

বাজকাশ ভারতের মতের নিমানবার বাজর পর্নবিক্ষণ কেন্দ্র থাজনে ভারতে রাজরের প্রচশন মাত্র করেক বছর আগে হয়েছে। ভারতে প্রথম রাজর বছাটি 1956 সালের মাঝামাঝি দমদম বিমান বন্দরে (বর্তমান নাম নেতাঞ্জী সূভাব বিমান বন্দর) প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে একটি রাজর বস্তাের আনুমানিক মূলা প্রায় 18 লক্ষ টাকা। গবেবশার ক্ষেত্রে রাজার এক নবযুগ এনে দিরেছে। শক্রপক্ষের বিমান ধ্বংশের জন্য একদিন রাজর আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু আহ তা মানবের কল্যাাণকর ও গঠনমূলক কাহে ব্যবহৃত হয়ে মানব সভাতাকে বহুদুর এগিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞানের গতি থেমে নেই। সূতরাং মানব সভাতার অগ্রগতিতে ভবিষ্যতে রাজার যে বিরাট ভূমিকা গ্রহন করবে তা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

বর্তমান যুগে রাডারের ব্যবহার

জলে,স্থলে,আকাশে এখনও রাডারের ভূমিকা বর্তমান যুগে কল্পনাতীত ভাবে বেড়ে চলেছে।

ভূমি সংলগ্ন রাভার : কোনো অজানা বতুর অনুসন্ধান ও অবস্থান নির্ণয়ের জন্য এবং বিমান এবং শূন্যে লক্ষ্যবস্তুর পথরেখা নির্ণয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়।

জাহাজে অবস্থিত রাডারের সাহায়ে সমুদ্রে বা নদীতে বয়ার অবস্থান নির্ণয়,

সমুদ্রতীর বা তটরেখা, নদীর ভাঙার অবস্থান, অন্যান্য জাহাজের অবস্থান নিরীক্ষণের । জান্য ব্যবহার। নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজের জন্য এর ভূমিকা অপরিসীম।

বিমানবাহিত রাডারের সাহায়ে অন্য বিমান সমূহের,জাহাজের অথবা স্থল্যানের সন্ধান ও পথরেখা নির্ণয় করা হয়। বিমানবাহিত রাডারের সাহায়ে পৃথিবীর কোনো জায়গার মানচিত্র কেন্দ্রীভূত ঝড় ও ঘূর্ণিবার্তার অবস্থান, ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভূখপ্তের অবস্থান (যেখানে মানুবের পক্ষে দুর্গম জায়গা) এবং নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজে বিমানবাহিত রাডার ব্যবহার করা হয়। স্থলে এবং সমূদ্র থেকে দূর নিয়ন্তব্ণ যদ্পের সাহায়ে বিমানের নিরাপদে উঠানামা করানো হচ্ছে রাডারের সহায়তায়।

সেনাবাহিনীতে রাভারের প্রচলন বেশি হলেও বরতমানে অসামরিক ব্যবহার অর্থৎ নাগরিক সভ্যতা উন্নয়নে রাভারের ব্যবহার দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। রাভারের ব্যবহারকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১) এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (Air Traffic Control) সংক্ষেপে এটিস ATC পৃথিবীর সর্বএই বিমান বন্দরের নিকটে এবং বিমান পথে বিমানের সৃষ্ঠ্ অবতরণ ও উত্তোলনের জনা রাডারের সাহায্য নেওয়া হয়। উচ্চ বিশ্লেষণ কমতা সম্পন রাডারের সাহায্যে বড় বড় বিমান বন্দরের বিমান চলাচলকে এবং ভূতল যানকে নিয়য়্রণ করা হয় গ্রাউন্ড কন্ট্রোল অ্যাপ্রোচ (জিসিএ) (GCA) ব্যবস্থা যুক্ত রাডারের সাহায্যে থারাপ আবহাওয়াতেও বিমানকে নিরাপদে অবতরদের জনা রাডার সাহায্য করে।

## ২) এয়ার ক্র্যাফ্ট নেডিগেশন

প্রবল ঝৠা,ত্যারপাত,পর্বতের চূড়া ইত্যাদি থেকে বিমানকে রক্ষা করার জন্য বিমানিকরা আবহাওয়া দ্রীকরণ মৃক্ত রাডার বাবহার করেন। কোনো দেশের ভৌগলিক সীমার যাতে কোনো বিমান চুকে পড়তে না পারেতার জন্য রাডার বাবহার করা হয়। রেডিও উচ্চতামাপক যন্ত্র বা (FM/CW পালস্) এবং ডপলার নেভিগেটর (নৌচালন কম্পাস যন্ত্র) এদের গুনাগুনের বিচার করে বর্তমানে এদের রাডার (অনুসন্ধান যন্ত্র) শ্রেণির মধ্যে ধরা হয়। HF (ক্ষুম্ম তরঙ্গ) যোগাযোগ বাবস্থায় 'আয়ন - মণ্ডল সাউন্ডার' - কে বর্তমানে রাডার শ্রেনি ভূক্ত করা হয়েছে। কখনো কখনো 'গ্রাউন্ড ম্যাপিং রাডার ' অথবা উচ্চ বিশ্লেষণ ক্ষমতা রাডার বিমানযাত্রা বা নৌযাত্রার কাজে বাবহার হয়। কোনো জাহাজের নিরাপদ চলাচলের জন্য এবং অনা জাহাজ থেকে সরাসরি ধাজা প্রতিরোদ করার জন্য এবং সমুদ্রে বা নদীতে বয়ার অবস্থান নির্ণয়ের জন্য, কম আলোতে এমনকি অন্ধকারে রাডারের সাহাযা নেওয়া হয়। বন্দরে নজরদারী করার জন্য জাহাজের নাবিকরা উচ্চ বিশ্লেষণ ক্ষমতাসম্পন্ন তীর সন্ধানী রাডার বাবহার করেন। বর্তমানে 'স্বয়ংক্রিয় ধাজা

নিরোধক রাডার চালিত যন্ত্র' (প্লেট এক্স্টাকটার নামে পরিচিত) বাণিজ্যিকভাবে মৃক্ত । বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। বিদেশে (জার্মানি ও জাপান ) এই ধরনের রাডার লাগিয়ে দুটো টেনের মুখোমুখী সংঘর্ষ এড়ানোর পরিকল্পনা নিয়ে বাস্তবায়িত করেছে।

#### ৩) মহাকাশ

রক্টে যালে রাডার ব্যবহার করা হর পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে পৌছানোর জন্য এবং দুই বা ততােধিক মহাকাশ যানকে মহাকাশে সংযুক্ত করা বাতাদের সংযুক্ত হওয়ার জন্য এবং চন্দ্রে অবতরশের জন্য।

ভূমি থেকে 'বৃহৎ ক্ষমতা সম্পন্ন রাডারের' সাহায়ে কৃত্রিম উপগ্রহের অবস্থান এবং যাত্রাপথ নির্যারণ করা হয়।

## ৪) দ্রনিয়ন্ত্রণ অনুসন্ধানকারী যন্ত্র খুলিত রাভার

সমন্ত রাডার হচ্ছে দ্রনিরন্ত্রণ অনুসন্ধানকারী যন্ত্র। কৃত্রিম উপগ্রহের বাবহৃত দ্রনিরন্ত্রণ অনুসন্ধানকারী রাডার আবহাওয়া নির্নয়ে এবং মহাকাশে চম্ম ও অন্যান্য গ্রহে অনুসন্ধান কার্যে বাবহৃত হয়। দূর নিয়ন্ত্রণ অনুসন্ধানকারী রাডার পৃথিবীর ভৃগর্ভে প্রাকৃতিক সম্পদ নির্ণয়ে যেমন -

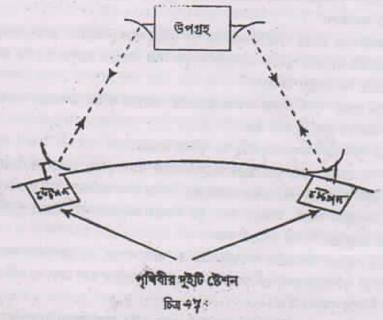
১) সমুদ্রের অভান্তরের অবস্থার চিত্র, ২) জল সম্পদ, ৩) মেরুদেশে বরফের বিতৃত ৪) কৃষিজাত দ্রব্য, ৫) বনভূমির অবস্থা ৬) ভূতাত্বিক গঠন এবং ৭) পরিবেশ দূবণ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

উপসংহারে বলা যার বিজ্ঞানের গতি থেমে নেই। শক্রপক্ষের বিমান ধ্বংসের জন্য একদিন রাডার আবিষ্কৃত হয়েছিল বিজ্ঞানকে ধ্বংস অথবা সৃষ্টি কোন কাজে নিয়োজিত করবে তার সিদ্ধান্ত নেবার ভার পৃথিবীর সমন্ত মহাদেশের সব মানুবেরইমানব সভাতার অগ্রগতিতে ভবিষাতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে রাডার বে বিরাট ভূমিকা পালন করবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

## vi) উপগ্ৰহ যোগাযোগ (Satellite communication)

কৃত্রিম উপগ্রহকে রিপিটিং স্টেশন (repeating) হিসাবে ব্যবহার করে এবং জাগরা থেকে অন্য জারগার TEM তরঙ্গের মাধ্যমে যোগাযোগ করা যায়। আটিনিউমেশন, বিচ্চুরণ ইত্যাদি কারনে বাহক হিসাবে তডিং চুম্বকীয় তরঙ্গ অবিকৃতভাবে বেশী দুর সংকেত বহন করতে পারে না। উপগ্রহ মহাশূন্যে ঐ রিপিটারের কাজ করে।

যেহেতৃ পৃথিবী নিজে অক্ষে সর্বদা যুরছে সেজন্য কোন উপগ্রহকে স্টেশন (চিত্র-৭) হিসাবে ব্যবহার করতে হলে তাকেও পৃথিবীর স্বাপেক্ষে স্থির থাকতে হবে। সেজন্য উপগ্রহের ঘূর্ণণ গতির পৃথিবীর ঘূর্ণণ গতির সমান করে তাকে জিও স্টেশনারী (Geo-stationery) রাখা হয়। উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার যে দুটি স্টেশনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় তাদের প্রত্যেকটি তে একটি করে সঞ্চালক অ্যানটেনা,বিবর্ধক এবং লো নমেজ (Low noise) এর শক্তিশালী গ্রাহক থাকে।



স্থির উপগ্রহ বাবস্থার ব্যবহৃত কম্পান্ত হল: 2000 MHz থেকে 8400 MHz. সম্প্রচার উপগ্রহের ক্ষেত্রে বাবহৃত কম্পান্ত হল: 10.7 GHz থেকে 256 GHz.

vii) আর্কিক সঞ্চার ব্যবস্থায় মডেম (Modem) ও কোডেক (Codec)

টেলিফোনের মাধ্যমে যখন কোন সংকেত (অ্যানালগ বা ডিজিটাল) পাঠানো হয় সেই সংকেত এসি সংকেত হিসাবে পাঠানো হয়। 1KHz থেকে 2KHz পালার মধ্যে একটি বাহক তরঙ্গকে নিরবিছিল টোন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সংকেত সঞ্চালনের জনা এই বাহক তরঙ্গর বিস্তার, দশা এবং কম্পাংকের পরিবর্তনকে কাজে লাগান হয়। এই বাবস্থাকে বল হয় মড়লেশন (Modulation)। যখন কোন সংকেতকে টেলিফোনের মাধ্যমে পাঠানো হয় তথন বাহক তরঙ্গকে ঐ সংকেত দ্বারা মড়ালেট করা হয় এবং ঐ মড়লেটেড তরঙ্গকে টেলিফোনের মাধ্যমে পাঠানো হয়। আবার যখন টেলিফোনের মাধ্যমে কোন বাহক তরঙ্গ গৃহীত হয়, তাকে ডিমড়ালেট করে এসি সংকেতে পরিনত করা হয়। এই বাবস্থাকে মড়লেশন ডিমড়ালেট (Modulation Demodulazion) সংক্ষেপে MODEM বলা হয়। যখন টেলিফন দ্বারা প্রাপ্ত কোন সংকেতকে কমপিউটারে গ্রহন করতে হয় বা কমপিউটার থেকে সংকেতকে টেলিফোনের মাধ্যমে সঞ্চালিত করতে হয় তথনই মডেম বাবস্থার দরকার হয়। একটা

মোডেম যন্ত্র সেকেল্ড যে পরিমান সংকেত টেলিফোনের মাধ্যমে পাঠাতে সক্ষম তাকেই মোডেমের উৎকর্ষতা বলে। বর্তমানে যে সব মডেমের ব্যবহার চালু আছে তার উৎকর্ষতা (9.6 kb/s) থেকে (56 kb/s)।

	১ গ্রাউন্ড	
	२) সঞ্চালন	
কম্পিউটার	৩) গ্রহন	মতভম
2	৪) তথ্য	
-	৫) অবাধ তথ্য পাঠালো	
	৬) তথা সংগ্ৰহে বাধা	
	৭) সাধারণ প্রচ্যপণ	
	৮) বাহক তরঙ্গ গ্রহন	7
	১) তথ্য প্রান্ত প্রস্থ	
	50)	
	35)	
1	54)	
	20)	100
	RS232C या RS449	
	চিত্ৰ - ৪	

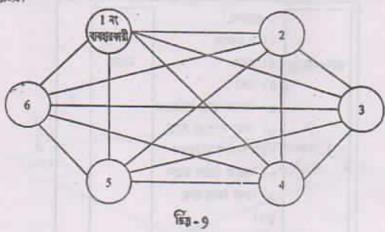
ইলেকটনির ইনভাসটিজ আসোসিয়েশন (EIA) কমপিউটার ও মডেমের মধ্যে আন্তজার্তিক সংযোগ উপরের চিত্রে [8] (RS232C বা RS449) দেখালো হয়েছে। যখন কমপিউটারে মডেম যন্ত্র লাগালো হয় তখন তাকে ডাটা টারমিনাল যন্ত্র (Data Terminal Equipment বা DTE) এবং (Data-circuit Terminal Equitment বা DTE) বলা হয়। কারল কমপিউটার তথ্য সরবরাহ করে এবং মডেম তাকে বাহক তরঙ্গে স্থাপন করে।

মডেম এবং কমপিউটার ২৫টি পিন দ্বারা যুক্ত থাকে। এই পিনগুলি প্রত্যেকটি একটি লজিক সাইচের (দ্বিক সংকেড 1 বার 0) কাজ করে। যেমন মডেম যখনই টেলিফোনে কোন বাহক তরঙ্গের সংকেড পায় ৪নং পিন লজিক 1এ সেট হয় ইজাদি। উপরের সারিতে মোট ১৩টি পিন এবং নীচের সারিতে 12টি পিন থাকে।

অনুরূপভাবে যে যদ্রের সাহায়ে কোডিং (coding) ও ডিকোডিং (decoding) কার্য সম্পাদিত হয় তাহাকে codec বলে। মোডেম ও কোডেক যন্ত্র দুটির অন্ধিত উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে।

## viii) যোগাযোগ ব্যবস্থায় ইনটারনেট (Internet)

অনেকগুলি কমপিউটার ব্যবহার কারীর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বলা হয় ইনটারনেট। পারস্পরিক বলতে বোঝায় প্রত্যেকের সঙ্গে সকলের যোগাযোগ (চিক্র-৪)



যোগাযোগ কথাটির অর্থ হল - তথ্য,প্রোগামিং,সফটওয়ার সমস্ত কিছুর আদান এবং প্রদান। আদান প্রদান বলতে বোঝার একটি নেটের যে কোন সদস্য অনাের যদ্রে কিছু সরবরাহ বা স্থাপন করতে পারে। এইসব কাজের জন্য একটি সাধারন নিয়ম পালিত হয়। এই নিয়মকে প্রাটাকল (Protocol) বলে। এই প্রোটাকলকে ট্রান্সমিশন কনটোল প্রাটাকল বা ইনটারনেট প্রোটাকল (Internet Protocol বা IP) বলে। এই নিয়ম মেনে প্রত্যেক বাবহারকারীর একটি (IP ঠিকানা (Address) থাকে - যার সাহাযাে নির্দিষ্ট পরিমান তথ্য গ্রহন বা পাঠানাের ক্ষমতা বোঝায়। যেমন 10bit IP ঠিকানা বলতে বোঝায় একবারে 10 bit পরিমান তথ্য আদান প্রদান করতে পারবে।

ইনটারনেটের সাহাযে। মৃখাত চার প্রকর কাজের জন্য বাবহাত হয়।

- ১) ই মেল (e-mail) বা ইলেকট্রনিক ডাক ব্যবস্থা : এই ব্যবস্থায় অপরকে কোন বার্ডা প্রেরন করা যায় অথবা কোন বার্তা গ্রহন করা যায়।
- ২) চাটিং (Chatting) : ব্যবহার কারীরা কোন সাধারন বিষয়ে সরাসরি আলোচনা কেমপিউটার কী বোর্ডের সাহায়ো প্রিন্ট করে) করতে পারে। ই - মেল এবং চ্যাটিং এর মধ্যে পার্থকা হল চিঠি লেখা আর টেলিফোন করার পার্থকাের মত।
- ৩) রিমোট লগ হন (Remote log-in) : নির্দিষ্ট প্রোগামিং এর সাহাযো একজন বাবহারকারী অন্যের যন্ত্রে সরাসরি কাজ করতে পারে।
  - ৪) ফাইল ট্রানস্ফার (File Transfer) : নির্দিষ্ট প্রোগামিং এর সাহায্যে একটি

যদ্রের মেমরীতে সংরক্ষিত ফাইল অনা যদ্রে সংরক্ষদের জন্য পাঠানো (transfer) যায়।

উপরের আলোচিত স্বিধাসমূহ ওয়ার্ন্ড ওয়াইড ওয়েব (world wide web) বা www ব্যবস্থার আরও সহজ্ঞলন্ডা হয়েছে। এই ব্যবস্থার পাঠা বিষয়, ছবি ইত্যাদি সম্বলিত তথা প্রদশনের ব্যবস্থা আছে। এই প্রোটোকলের সাহায্য দাতা (host) তার তথা যে কোন নেটে পাঠাতে পারে এবং ঐ তথা অপর যে কোন নেটের সদস্য অবায়ে গ্রহন করতে পারে। প্রতিটি দাতার একটি নির্দিষ্ট পরিমান IP ঠিকানা থাকে। www প্রোটোকল হল http (hyper text transfer protocol)। এই প্রোটোকলের দৃটি বৈশিষ্টা হল এই নিয়মে ব্যবহারকারী দাতার কাছে তথার জনা অনুরোধ পাঠায় এবং দাতা তথনই সাড়া দেয় এবং প্রয়োজনীয় তথা সরবরাহ করে।

ন্যানো টেকনোলজীর পথিকৃৎ হিসাবে যে দুজন বৈজ্ঞানিক 2007 সালের পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন – তাদের একজন হলেন ফ্রান্সের নাগরিক আালবার্ট ফার্ট। জন্ম 1938 সালে, ফ্রান্সের Carcassome নামক শহরে। পাারিস sud বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্ররেট ডিগ্রি করেন 1970 সালে, ওখানেই অধ্যাপনা করেছেন 1976 থেকে 1995 সাল পর্যন্ত। বর্তমানে, সি এন আর এস এ ইউনাইটেড দ্য ফিজিকে (ফ্রান্স) সায়েন্টিফিক ডিরেইর হিসাবে কাজ করছেন।



অ্যালবার্ট ফার্ট



পিটার গুলবার্গ

অন্যজন জার্মান নাগরিক পিটার গ্রুনবার্গ জার্মানীর পিলসেন শহরে তাঁর জন্ম 1939 সালে প্রোফেসর গ্রুনবার্গ পি এইচ ডি করেছিলেন 1969 সালে Darmstadt শহরে অবস্থিত টেকনিকালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। 1972 সাল থেকে অধ্যাপনা করে আসছেন জার্মানির Institute fiir Feszkorperforcloung এ।

উপরোক্ত দুজন পদার্থবিদকে নোবেল প্রস্তারে ভূষিত করা হল 'For the Discovery of Giant Magnetoresistance' এই 'জি এম আর' টোম্বক বিজ্ঞানে একটি সৃদ্র ফলপসারী বৈজ্ঞানিক আবিস্কার, যার সূত্রপাত ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীর আশি দশকের মধাভাগে। টোম্বক এবা অটোম্বক পদার্থের পর্যায়ক্রমে সৃক্ষ

ন্তর (করেক আটম পুরু মাত্র) বানিরে (টোম্বক পদার্থদৃটি ন্তরের মাঝখানে একটি অটোম্বক পদার্থের সূক্ষ ন্তর ) তৈরী হয় ডিভাইস, যাতে জি এম আর ঘটনা প্রদর্শিত করা যায়। টোম্বকরের সামান্য পরির্বতনে তড়িং রোধের বিশাল পরির্বতন ঘটে যা হার্ড ডিস্কে চুম্বকীয় সংরক্ষিত তথ্যকে তড়িং সংক্রেতে রূপান্তরিত করে কমপিউটারে রীড করা যায়। সূতরাং কমপিউটারে hard disk থেকে Data পড়ার যে সব প্রযুক্তি রয়েছে তার পেছনে রয়েছে এই জি এম আর। আরো নতুন ধরনের ক্ষুদাতিক্ষুর্ব (ন্যানো) যন্ত্রপাতি তৈরী হবে এর উপর নির্ভর করেই। ল্যাপটপ থেকে শুরু করে আই পড়স্ প্রভৃতিতে যে সব অতি ক্ষুত্র চিল্স ব্যবহার করা হয়, তা সম্ভব হয়েছে এই জি এম আর জন্য।

উপসংহার : সারা বিশ্বজ্জ টেলিফোন যোগাযোগ, দুর্মন্দন সম্প্রচার ও কমপিউটার নেটওয়ার্কের অভ্নতপূর্ব প্রসারের ফলে বর্তমান যুগে ব্রড ব্যান্ড সঞ্চার সঞ্চার প্রযুক্তির এক অতি গুরুত্বপূন বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। ব্রড ব্যান্ড সঞ্চারের মূল লক্ষ হল সংক্রেত সঞ্চারের ভৌত মাধ্যম (যেমন বায়ুমন্ডল,বা আলোকীয় তন্তু) এর চ্যানেল ক্ষমতা বাড়িয়ে একযোগে বহু সংখ্যক স্বতন্ত্র সংক্রেত প্রেরন সম্ভব করে তোলা। বিগত শতকের প্রথমার্যে আন্ত: মহাদেশীয় সঞ্চার রজ্জু সহযোগে ব্রড বান্ড সঞ্চারের সূচনা হয়েছিল। তবে কেবল সঞ্চার রজ্জুর মাধ্যমে আজকের দিনে বিশাল মান্ত্রার তথ্য প্রবাহ (information flow) সংগঠিত হওয়া সম্ভব নয়। অনুতরঙ্গ সংযোগ ও উপগ্রহ সহযোগে সঞ্চার এ দৃটি সাম্প্রতিক কালে ব্রড ব্যান্ড সঞ্চারের দৃই মূল স্বস্ত। এর সঙ্গে বিগত কয়েক দশক ধরে যুক্ত হয়েছে আলোকীয় তন্তু সহযোগে সঞ্চার আলোকীয় তন্তু কান্ডে লাগিয়ে আগামী দিন পাটি বেদ (band width) জনিত সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা সম্ভব হয়ে।

উইলার্ড স্টালিং বয়েল (Willard Sterling Boyle)



Willard S. Boyle

তিনি 1924 সালের 19 আগষ্ট আমহাস্ট, কানাডাতে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক তিনি বর্তমানে ইউ এস এ র বেল ল্যাবরেটরিজ সঙ্গে যুক্ত। সেমিক-ডাকটর সার্কিটের ইমেজিং যাকে এককথায় বলে সি সি ডি সেন্সর) এর আবিস্কারের জন্য এই পুরস্কার পাচ্ছেন। 1950 সালে ম্যাক গিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পি এইচ ডি করেছিলেন। 1953 সালে বেল ল্যাবরেটরির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। 1962 সালে ডন নেলসনের সঙ্গে রুবি লেজার অপারেট করা আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি এবং জর্জ এলউড স্মিথ চার্জড কাপলড় ডিভাইস (সি সি ডি) নিয়ে গবেষনা করে। 1973 সালে ফ্রান্ডলিন ইনস্টিটিউট স্টুয়াট ব্যাল্যাস্টইন মেডেল পেয়েছিলেন। সি সি ডি যা ইলেকট্রনিক চক্ষু (Electronic Eye) নামে পরিচিত। ইলেকট্রনিক চক্ষৃ হল ডিজিটাল সেন্সারের সাহায্যে ইমেজিং টেকলোলজি। ডিজিট্যাল ফটোগ্রাফি হল ডিজিট্যাল কারিগরির সাহাযো কোন ও বিষয় বন্তুর ছবিতে একটি আলোক সংবেদশীল (ফটোসেনসিটিভ) সেন্সারের উপর প্রতিদ্বাপন এবং সংরক্ষন করা। এভাবে সংগৃহীত ছবিকে কাগজে ছাপা, ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষন বা ইচ্ছামতো পরিমার্জন করা সম্ভব। এই ফটোগ্রাফ তৈরী হয় অজস্র কৃদ্র কৃদ্র চারকোন আকৃতি রঙিন টুকরোর সাহাযো। একে পিয়েল (Pixel) বলে। এক একটি পিয়েল হল এক একটি ইমেজ ভেটা। ডিজিট্যাল জবস্থায় ডোলা হবিটি কতগুলি পিঙ্গেলের ব্যবহারে তৈরী হয়েছে ইমেজ কোয়ালিটি তার উপর নির্ভর করে।

জর্জ এলউড শ্মিথ (George Elwood Smith) :

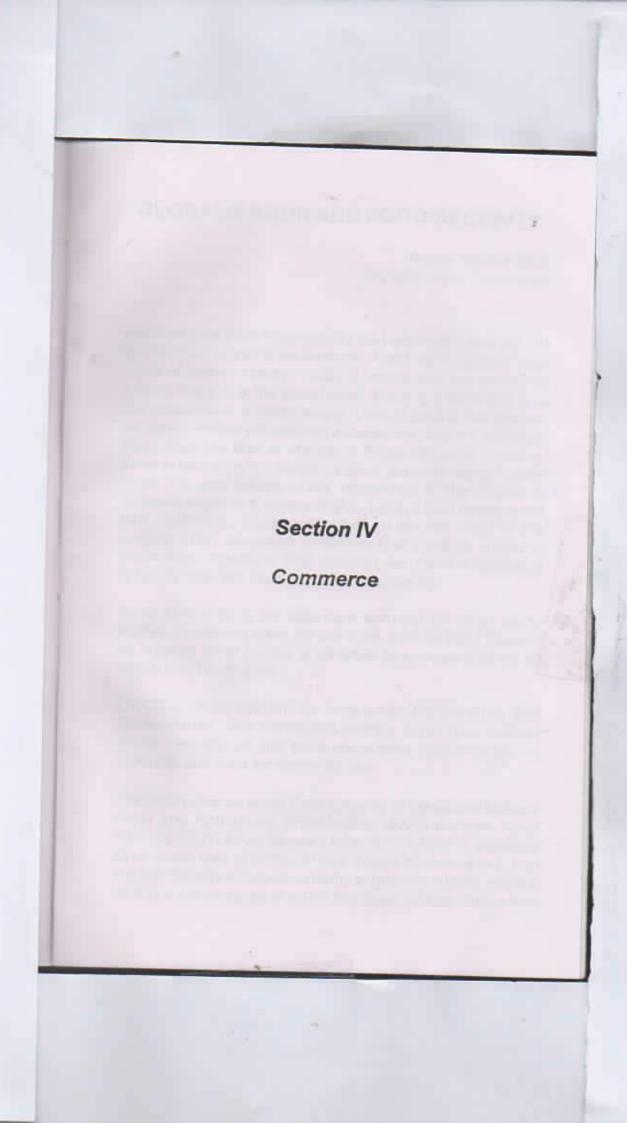


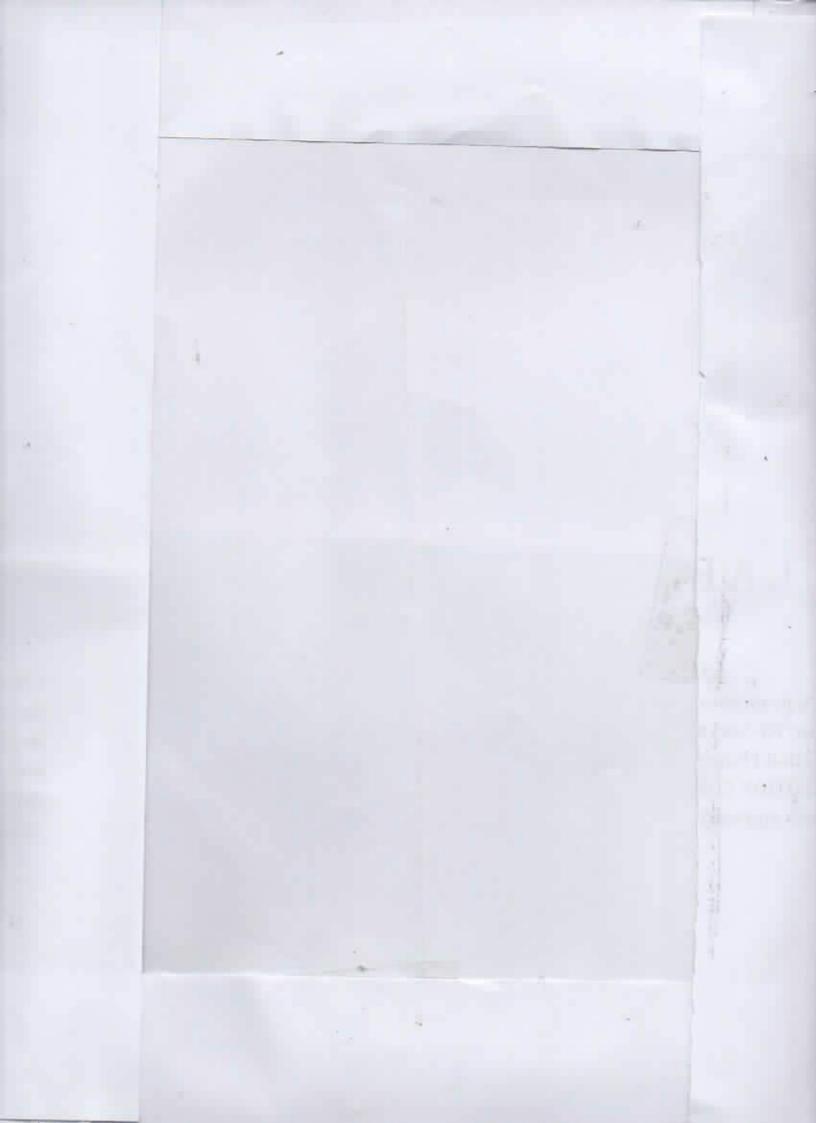
George E. Smith

তিনি 1930 সালের 10ই মে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক তিনি বর্তমানে ইউ এস এর বেল ল্যাবরেটরিজ এর সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি এবং তাঁর সহকর্মী উইলার্ড স্টালিং বয়েল দুজনেই চার্জড কাপল্ড ডিভাইস (সি সি ডি) আবিস্কার করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

সি সি ভি হল ডিজিট্যাল ক্যামেরার ইলেক্টানিক চোখ। এর সাহায্যে বিশ্ববস্তাহভর যে কোন বস্তুর পরিস্কার ছবি এবং সমৃদ্রের গভীরতা ও পরিস্কারভাবে লক্ষ করা যায়। মানুষের শরীরের ছবি তৈরী করে রোগ নির্নয় করা হয় এবং সৃক্ষ অস্ত্র চিকিৎসায় (micro surgery) ও সিসি ডি কারিগরিবিদ্যা ব্যবহৃত হয়।







# GLOBALISATION AND FOOD SECURITY

Dipak Kumar Nath
Department of Commerce

Food is more than a commodity that is brought and sold. It is more than nutrients we consume. Food meets and manage kinds of human needs — cultural, social and psychological among them. It is the social good. Food is a feeling, it is in the imagination, it binds people. Lack of food is the ultimate exclusion. When people dont's have food they are excluded from what the rest of society is doing regualrly — eating. Food is the good that keeps us alive, the over-riding human need, the very means of life, recognized in the charter of United-Nations as a Human Rights. Lack of food brings about pain, suffering, illness and death, it causes most of the world's killer diseases; it means that parents watch in powerless anguish as their children die. Food is special; it is totally different from any other commodity.

Food Security is an important concept for most world bodies. The World Bank, for example, defines Food Security as 'access by all people at all times to enough food for an active and healthy life'.

OECD - 'Organisation for Economic Corporation and Development', the developed world's think Tank defined 'Food Security' as the adequate stable supply of favour products and food for domestic use.

The committee on world Food Security of the United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) defines 'Food Security' thus: Food Security means that food is available at all times, that all persons have means of access to it, that it is nutritionally adequate in terms of quantity, quality, variety, and that it is acceptable within the given culture. Only when

all these conditions are in place can a population be considered 'Food Secure'.

Therefore, the definition of Food Security could be articulated as "Food Security is a fundamental right, may be defined as a sustained or round the year supply of food which is culturally acceptable, safe, adequate in quantity and quality (balanced food) with equitable distribution within the family.

In short, food security means;

Food availability at all times and In all places

- All households can afford to produce or procure the foods they need
- Contamination free food

Enough in quantity and balance in quality

 Contributory In controlling starvation, malnutrition and micro nutrient deficiencies.

Globalisation is generating food insecurity through a number of mechanisms. Trade liberalisation and globalisation of agriculture is supposed to increase the production of food as well as the efficiency of food production, alleviate the economic situation of farmers and improve patterns of food consumption. But in country after country trade liberalisation is leading to a decline in: food production, productivity and in the conditions of farmers in the North as well as in the South. Besides, there is less food security for consumers, both in the North and the South.

There are five, major sources of external liberalisation or globalisation of agriculture in India:

 The Structural Adjustment Programme (SAP) of the World Bank.

II. The Agreement on Agriculture of the World Trade Organisation (WTO).

II. Bilateral trade pressure from countries such as the US.

- Internal policy pressure by TNCs in agribusiness.
- Commitment of experts and policy makers to the external liberalisation programme.

External liberalisation is foreign-trade and foreign-investment driven liberalisation: it serves external interests. Agricultural liberalisation under SAPs is an example of such external liberalisation. It consists of the following elements:

- Liberalising fertiliser Imports and deregulating domestic manufacture and distribution of fertilisers.
- · Removing land-ceiling regulations.
- Removing subsidies on irrigation, electricity and credit, and creating conditions to facilitate the trading of canal Irrigation water rights.
- Deregulating wheat, rice, sugarcane, cotton, edible oil and oil seed industries.
- Dismantling the food security system.
- Removing controls on markets, traders, processors and removing subsidies to cooperatives.
- Abolishing the Essential Commodities Act.
- · Abolishing the general ban on futures trading.
- · Abolishing Inventory controls.
- Abolishing selective credit controls on inventory financing.
- Treating farmers' cooperatives on an equal footing with the private sector.

The foregoing elements of SAP are not recipes for removing centralised control over agriculture but of concentrating it even further in the hands of agribusiness transnational corporations such as Monsanto, Cargill, Pepsico, etc. which are emerging as the new zamindars (landlords).

## INTERNAL LIBERALISATION:

Internal liberalisation, of agriculture implies liberating agriculture in the direction of ecological sustainability and

social justice. This includes:

- Freeing agriculture from high external inputs such as chemical fertilisers and pesticides and making a transition to a sustainable agriculture based on Internal, ecologically sustainable inputs.
- Freeing farmers from capital-Intensive farming and debt.
- Freeing, peasants from landlessness.
- Freeing farmers from fear of dispossession by monopolies of land, water and bio-diversity.
- Freeing the poor from the specter of starvation by ensuring food as a human right.
- Freeing rural people from water scarcity by ensuring Inalienable and equitable water rights.
- Freeing knowledge and bio-diversity from IPR monopolies.
- Rebuilding local food security, reinvigorating local

Internal liberalisation of agriculture is a pre-condition for food security while external liberalisation undermines food

# THE WTO AGREEMENT ON AGRICULTURE:

In addition to the foregoing components of liberalisation of agriculture under the SAP programme for India, the World Bank has also forced the entry of multinational seed corporations into the Indian seed sector. Combines with the Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) agreeement of WTO, this implies the total monopoly over agriculture by a handful of global corporations, and the total vulnerability of farmers to crop failure, indebtedness and starvation. The epidemic of suicides by farmers Signals the growing vulnerability, which is a consequence of the increasing takeover of Indian agriculture by transnational corporations.

The Agreement on Agriculture of the WTO is another example of external liberalisation. Agriculture of the WTO is another example of external liberalisation. Agriculture has

never been part of GATT. It was introduced during the Uruguay Round. The Agreement on Agriculture has three sections:

- Export competition or export liberalisation (Article 9)
- Market access or import liberalisation (Article 4)
- Domestic support or reduction of domestic subsidies (Article 6)

Part V, Articles 8-11 of the Agreement on Agriculture deal with exports under the title 'Export Competition'. While the justification for the Agreement on Agriculture in WTO is the removal of export subsidies which have facilitated the scale of large European Community and US surpluses on the world market, depressing world prices and displacing farmers, export subsidies' are still permitted in the Agreement on Agriculture: The main elements of the export subsidy commitments read as follows:

- Export subsidies, measured in terms of both the volume of subsidised exports and in terms of budgetary expenditure on subsidies, have been capped.
- Developed countries are committed to reducing the volume of subsidised exports by 21 % and the expenditure on subsidies by 36 per cent, both over a six-year implementation period (1995-2000).
- For developing countries the reduction commitments are 14 per cent and 24 percent for volume and expenditure respectively, whilst the implementation period (1995-2004) lasts ten years rather than six.
- Governments of developing countries can however continue to subsidise costs of marketing exports of agricultural products including handling, upgrading, other processing costs as well as costs of international transport and freight. The costs of internal transport and

freight charges on export shipments can continue to receive subsidies.

Trade liberalisation is generating food insecurity at four levels. 'It is leading to:

- A transfer of resources from peasants to Industry.
- A shift of land use from the production of staple foods to luxury and non-food crops (cash crops) such as shrimp and flowers for exports.
- Diversion of cereals from domestic markets to exports, creating domestic scarcity and rising prices.
- Removal of good subsidies, thus reducing domestic consumption and Increasing food exports.

# CORPORATISATION OF FOOD:

Denial of people's food entitlement

The World Bank and WTO driven policies of the central government are in fact, policies for the total corporatisation of India's food and agriculture system. The dismantling of the PDS and the sudden withdrawal of the FCI from procurement, without any support to states and without a transition time to create alternatives for food security is a recipe for corporation control, not 'decentralisation',

The centre's proposal for a 'decentralisation' of the food system by reducing procurement and distribution by FCI and giving this role to the states gives the garb of respectability and federalism to the effort to hand over the nations food system and food security to corporations.

 The centre is fully aware that the states are in no position, either, in terms of financial resources or in terms of infrastructure to take over food procurement.

- The centre has given no interim subsidy or time for the states to develop such resources or Infrastructure.
- The central issue price, which was Rs. 450/quintal in April 1995, increased to Rs. 682/- quintal in April 1999, almost doubled at Rs. 900/quintal in 2000, forcing states to reduce their PDS offtake and thus create pseudo-surpluses. Today states pick up just around 47.4 % of their quota for rice and 33.8% of their quota for wheat. In fact, the offtake of wheat for the PDS has declined from 8.03 million tones in 1991-92 to 5 million tonnes in 2000.
- Simultaneously the government dismantled the PDS system, and announced a meager 10 kg foodgrains per family per month for those below the poverty line, which contributed to lowered offtake by states and thus created pseudo surpluses.
- The identification of the people below the poverty line has been tied in bureaucratic redtapism and very few of the really poor have been identified to date.
- The numbers of the poor as announced by the centre following the National Sample Survey 2000 is itself being questioned as there is wide discrepancy between this figure and the estimates of the Planning Commission, which were substantially higher.
- The centre is going ahead with subsidies for corporations through tax reductions, tax holidays and other incentives for building silos, building cold storage depots, taking over-transportation of foodgrains and taking over building and owning ports for exporting foodgrains.
- In addition, 'the government is subsidising corporations (with public money) by constructing roads and highways and international airports with the transport requirements

of agribusiness corporations being given priority.

Government policies

The policies of Governments in this region are greatly influenced by the World Bank (WB) and its structural adjustment policies and programmes (SAP). These Governments have accepted the globalisation process as a means of development of their country. As a result, they are compelled to liberalise various policies, programmes etc. In order to allow the TNCs & MNCs to come In and start their business activities in their country. One of the significant steps have been taken by our Government is to reduce its fund allocation for social welfare activities and withdrawal of subsidies, in phased manner, from agricultural sector. This has not only affected the marginalised and small farmers but the poor living below the poverty level.

For instance, the state prescribed HYV and hybrid seeds require much more amount of fertilizers, insecticides and pesticides (which are harmful to health and ecology) than the indigenous varieties for the same area of land. But the farmers neither have sufficient own means or easy credit facility to procure the essential item for modern way of farming. Whereas the governments of these countries are generous in giving subsidy for agro-chemical industries, rather than subsidizing in indigenous seeds production and marketing of environment-friendly organic fertilizer production. Another interesting thing is happening in these countries are that, the findings / outcome from whatever research activities is going on in these countries on agricultural aspects, are hardly applied in our agricultural activities.

The terms & conditions of WTO are restraining the governments to make the Public Distribution System (PDS) inactive. In Nepal there is no functioning of PDS in Bangladesh PDS is partially functioning and in India PDS scheme has been worst as far as implementation is

concerned. It has also been noticed that the people (poor and marginalized, in particular) have not been allowed to participate in governance especially in case of PDS at community level.

Because of those inadequate and unfriendly govt. policies for the poor community at the large becoming dependent on the large manufacturing companies have supply food and other essential items of their livelihood support. At the same time, liberal policies of Govt. allowed the multi-national companies to enter into agricultural sector in phase manner and acquire land and other natural resources for their commercial and profit making activities. It is feared that in long run these initiatives would destroy the bio-diversity and natural resources of these countries' and finally cause serious environmental degradation.

## Government Response:

The government is aware that for food security, production of food is important but we need to do much more to see that food so produced reach those who need to eat them. The government has made two interventions: one, the Public Distribution System (PDS) and two, the system of price incentives to farmers, to grow more food and sell them for feeding into PDS.

Many consider the PDS to be the most important component of food security policy of the government. It was started in the early 1960s, and entails supplying essential commodities at subsidised prices to the vulnerable sections of society. This is also designed to shield the poor from the volatility of prices and fluctuations in the supply of essential commodities. The PDS in India has' a network of over 4,00,000 fair price shops (FPS) and serves about 160 million families and is probably the largest distribution system of its kind in the world. Many commentators, including Sen, maintain that India could avoid large scale

famines and save millions of lives because of the PDS, something that other countries, which did not have such a system, failed to prevent.

In the macro-micro terminology, the PDS in India is intended to translate the macro-level self-sufficiency in foodgrains to micro-level food security by ensuring access to food and other essential commodities, to poor families. The PDS Is also a way of transferring resources and providing the consumption, to ensure a decline in the impairment of human capital.

A Revamped Public Distribution System (RPDS) was started in 1992 in areas where the poor are concentrated, covering 1,775 blocks falling under the ITDP, DPAP, DHA and DDP areas. For the RPDS, foodgrains were released by the Government of India to the state government for the normal PDS. The price differential is Re. 1 per kg of foodgrains released. The RPDS was targeted at everyone in the poor areas irrespective of economic status.

Following the decisions taken at both the Conference of Chief Ministers in July 1996 and of State Food Ministers in August 1996, the target of the PDS was changed to 'poor in all areas' from 'all in poor areas'. The new target of the PDS is the population below the poverty line in all areas. This Targeted Public Distribution System (TPDS) has been implemented in practically all the states (barring Punjab) and union territories (barring Delhi), Goa and Lakshadweep).

To back the PDS, the government procures foodgrains, notably rice and wheat, and has built up a large stock of foodgrains. This procurement of rice and wheat is backed by the price policy of a procurement price and a minimum support price. The prices are designed to promote farming and encourage surplus farmers to continue to grow 'more food in response to price incentives. The stocks of food in

excess of buffer norms arc called operational slacks, which arc distributed to the consumers, by and large in a' non-targeted manner, at subsidised prices. From the fiscal year 2000-2001, the government has cut down subsidies to PDS by Rs. 1000 crore and in the process has increased the price of foodgrains to be supplied to the people below and above the poverty line by a very substantial margin. The price of wheat has been raised to Rs. 4.70 per kg and the price of rice has been raised to Rs. 6.40 per kg, for below poverty line (BPL) families. The allocation for foodgrains per BPL families has been increased to 20 kg from 10 kg allocated earlier.

#### The Downside:

The PDS, however, has been widely criticised for its failure to reach the poor effectively, its urban bias and lack of transparency and accountability. Although the PDS is a centrally sponsored programme, its implementation is dependent on the state government. In states with appropriate political and administrative and infrastructure facilities, the public distribution system has worked; in most it has floundered.

Due to poor targeting the system is being used (misused) by all, Irrespective of the standard of living. Excepting for sugar, jowar and standard cloth, there is virtually no variation in the utilisation of items supplied according-to levels of living. The objective of resources transfer has not been achieved.

The leakage from the system and other wastes associated with PDS is proverbial. The inefficiency of the entire bureaucracy of food is questioned. A not insignificant number of observers believe that the PDS has served the interest of the big farmers only. Consequently no attempt has been made to extend the coverage to PDS to other crops and the required backup R&D has not come about.

Poverty Programmes by passing the poor.

... The Public Distribution System (PDS) In India, which provided essential food supplies at below market prices to Indian consumers, has problems reaching the poorest Indians. 0-60 per cent of the beneficiaries of PDS have been estimated to be non-poor. PDS network remains limited to poorer states. Poor states like Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh have received far less food supplies than less poorer states like Kerala and Andhra Pradesh.

Only about 40 per cent of the total wheat supply reach the poorest 40 per cent of the Indian people. The lower monthly purchases from PDS came from the very poor In India. Thus, the actual Income benefits of these subsidies remain limited for the poor: less than 22 paisa for every rupee.

In rural areas, PDS serves to raise Individual Incomes only modestly, amounting to 2.7 per cent of their per capita expenditure. In north and central India, where poverty is massive, PDS provides subsidies equal to an Income of only Rs. 2.5 per person per month. Thus with a few exceptions, the coverage of PDS remains uneven - with a large number of the poor being left out.

Source: Human Development in South Asia, 1999, Oxford University Press and HDC, Islamabad, 1999.

# The Reality:

If we move from the macro to the micro situation, things are not rosy.

The extent of endemic hunger has been brought out by the Planning Commission itself in its revised estimates following acceptance of the Dandekar Committee Report in 1997. According to the Planning Commission the number of people whose expenditures do not cover both food and non-food

items and ensure adequacy of food intake in 1993-94, is now estimated to be 'Over 244 million in rural areas and about 80 million in urban India .. That is, at least 37 'per cent of the rural people are poor. There are disputes about the data and methodology adopted by the Planning Commission in arriving at these figures. But the facts remain that the growth of the Indian economy in general and the growth in the food economy in particular have not prevented the growth in the absolute number of food insecure and chronically food deficient people in the country. Since the real wages for unskilled agricultural labourers have declined, the number of such food insecure and food deficient people must have increased.

This is corroborated by the fact that the forces of normal mortality unhindered by good nutrition and health care - kill more people every four or five years in India, than the death toll of the world's largest recorded famines. Calculations of general undernourishment - what is sometimes called 'protein-energy malnutrition' - is nearly twice as in India as is in sub-Saharan Africa on an average.

Judged by the usual standards of retardation in weight for age, the proportion of undernourished children in Africa is 20 to 40 per cent, whereas the percentage of undernourished Indian children is a gigantic 40-60 per cent. This early retardation has a long-term impact on health, morbidity and even cognitive skills. Thus while Indians live longer than Africans, there are many more undernourished children in India, in both absolute terms and as a proportion of all children, than in Africa. As Sen noted 'The nastiness of our nutritional bias is second to none.' If one were to add the gender bias at death, the picture is even more nasty.

Indeed, the reality is that hunger and tragedy hit different parts of the country every year, The cruel starvation deaths, sale of children and post-migration in western Orissa have attracted international attention. 'In the impoverished, drought stricken area of Kalahandi, a man sold his daughter for 30 kg of rice. These are not isolated cases.' Fields studies and village level analysis of scholars in eastern Uttar Pradesh and Bihar and even eastern' Haryana, clearly brings out hunger of different intensities. Even in a state like West Bengal hunger persists at the village level even if there are no starvation deaths. Starvation and hunger in some of the villages of Andhra Pradesh is a matter of public history and even today several districts of the state is on the brink of a prolonged hunger period.

There is clearly a gap between what public policy wants to do and policy makers think they can achieve, and reality. That gap leaves people hungry and they suffer from malnutrition and long-term damage, though not always death. Hunger is unacceptable. It is the first threshold to be crossed for overcoming poverty.

### Conclusion:

By understanding the historical and structural limits of 'globalist ideology' we can escape the tyranny of globalism. The alternatives are not disembodied utopias that are 'imagined' by individuals sitting in front of the internet. The alternatives grow out of the past and present experiences and opportunities that emerge from the failures and crisis of the 'export strategies'.

By focussing on social relations and the state as the building blocks of global empires we can escape the prison of globalist thinking and enter the realm of political and social action. The inversion of the policies of globalist ideologues leads to the formulation of an alternative strategy in which social mobilisation and state power provides a new class content to the shock treatments, industrial reconversions, and structural adjustments. The new socialism learns not only from its capitalist adversaries how to turn the tables but it also learns from the mistakes of the old socialism. It is

more inclusive incorporating women, consumers, ecologists. It possesses a greater sensibility to the nations of freedom at the workplace and on the farms. It possesses a greater appreciation of the consequential discourse that integrates personal values and public practice.

Dom Holdor Camara - tho Brazillan Bishop remarks - "What horror has the world come to when it uses profit as tho prime incentive in human progress and compitition as the supreme law of economics"

We are especially concerned with the widening gap between the poor of the world and the rich - not only of material goods, as the rich get richer, and the poor remain in misery - but the growing gap in understanding. The Indifference of the well-to-do is perhaps the major obstacle in the world today. We feel we must warn the people of the world that present trends tend toward the permanent pauperisation of 2/3 of the people of the world. The poor people of every nation are being locked out of the system of opportunity to remain in misery for future generations, unless mankind can find and choose a better way to live together.

### REFERENCES:

Anon, 'Insocurity of Wosrld Markot', Topic Paper 4, Euro Commission Solagral Seminar, Food Security Policy Long-Term Perspectives, Brussels, 1-3 April 1996, P-6.

Committee on World Food Security, Towards Universal God Security, Draft Policy Statement and Plan of Action 21st session, item III, Romo: Food and Agriculture Organisation, 29 January-2 February 1996, para 4. Maxwell, S., Food Insecurity in Northern Sudan, Sussex Institute of Development Studies, 1989.

FAD, so" Anniversary Symposium, Quebec, 1996.

FAD, Food and International Trade, WFS 96/ TECH/8, provisional, April 1996, P-5, para 3.1.

World Bank, Poverty and Hunger Issues and Options for Food Security In Developing Countries, Washington, DC, 1986.

'Food Policy', Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris, 1981, p.47.

United National Centre on Transnational Corporations, Transnational Corporations in Food and Beverage Processing, 1981.